ফিরে এসো জান্নাতের পথে

মাওলানা তারিক জামিল

ফিরে এসো জান্নাতের পথে

মুবাল্লিগে ইসলাম
মাওলানা তারিক জামিল

অনুবাদ ও সংকলন
মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস, হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম
বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়
বিন্‌নুরী লাইব্রেরী
পাঠক বন্ধু মার্কেট ৫০/বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : বিশ্ব ইজতেমা ২০১৫ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : বিশ্ব ইজতেমা ২০১৭ ইং
সংশোধিত সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮ ইং

ফিরে এসো জান্নাতের পথে

মাওলানা তারিক জামিল
অনুবাদ ও সংকলন ☐ মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন
প্রকাশক ☐ মাওলানা নুরুদ্দীন ফতেহপুরী
প্রকাশনায় ☐ বিননুরী লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল :০১৭২২৩৫৫৫৯৭
সর্বস্বত্ব ☐ অনুবাদ কর্তৃক সংরক্ষিত
হাদিয়া : ১৪০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-90309-2-8

প্রাপ্তিস্থান

মক্কা পাবলিকেশন্স
আশরাফিয়া বুক হাউজ
রাহনুমা প্রকাশনী
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
মাকতাবাতুস সাহাবা
দারুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাবলীগী কুতুবখানা
কালাম বুক ডিপো
ইসলাম পাবলিকেশন্স
সাজিদ প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মহান রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে তাঁর মনোনীত ধর্ম হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আর তাঁর উম্মত হিসেবে এ দ্বীনকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা দায়িত্ব ভুলে গেছি। আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত। আমার আপনার দায়িত্ব ছিল এসব বেদ্বীন মানুষগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়া। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়ার এ কাজই সম্পাদন করছে বিশ্ব তাবলীগ জামাত। উলামায়ে দেওবন্দ। হক্কানী পীর মাশায়েখগণ। নিঃস্বার্থভাবে যারা আল্লাহর পথে ডাকছে পথ ভোলা বান্দাদের। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে হাজার হাজার মুবাল্লেগ ছুটে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর পথে পথে। তেমনই একজন মুবাল্লেগ মাওলানা তারিক জামিল। তাঁর বয়ান হৃদয়স্পর্শী। যাঁর বয়ান হৃদয়কে করে রাখে সম্মোহিত। মাওলানার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াত এবং হৃদয়স্পর্শী বয়ানের বদৌলতে শত শত নারী পুরুষ তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে। ফিরে এসো জান্নাতের পথে নামক বইটি এমনই কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ। সে বয়ানগুলোতে তিনি অত্যন্ত আবেগী ভাষায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন জান্নাতের পথে ফিরে আসার। যা বাংলা ভাষায় আপনাদের জন্য আমাদের পরিবেশনা। আমরা আশা রাখি মাওলানার এ কথাগুলো সবার হৃদয়ে হেদায়েতের নূর হয়ে জ্বলবে। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আমি আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতের সবটুকু মুমিন হৃদয়ের আশার আলো, পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে চমকিত মদীনার পরশ মানিক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরনে নজরানা পেশ করলাম। আর এর সাওয়াব ও প্রতিদান কিছু থাকলে তা আমার মুহতারাম পিতা-মাতা ও সারেতাজ আসাতিজাগণের সমীপে নিবেদন করলাম। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। আমীন।

ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর অবগত করলে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

পূর্ব কথা ৩
প্রশংসার উচ্চতায় প্রভু আমার.. ৭
আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি দেখে ফেরেশতাগণের বিস্ময়! ১৩
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১৫
মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য ১৬
বিশ্বাসঘাতকতা আর কত কাল? ১৭
আমরা লুণ্ঠিত মুসাফির ১৯
একটি ঘটনা ২১
ফিরে এসো জান্নাতের পথে.. ২৪
আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালবাসার নমুনা ২৬
আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বতের আরেকটি ঘটনা ২৭
প্রকৃত জীবনতো তাই.. ২৮
আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা! আল্লাহ্ তায়ালাকে চেনো ৩০
আসুন তওবা করি ৩১
তওবাকারীর বিস্ময়কর ঘটনা ৩৩
শয়তানের পথ অনুসরণ কর না ৩৪
ইবলিসের প্রশ্ন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জবাব.. ৩৫
তাবলীগ নবীওয়ালা পথ– জান্নাতের পথ দেখায়.. ৩৬
আল্লাহকে আপন করে নিন ৩৮
যুবকের তওবা.. ৪১
কালেমার দাবী ৪২
দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান.. ৪৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো........ ৪৭
নবীওয়ালা পথ ৪৯
উম্মত তার দায়িত্ব ভুলে গেছে ৫০

দুনিয়া ধোঁকার ঘর ৫৩
হায় মরণ আমার কত কাছে! ৫৫
দুনিয়াদার সাবধান! ৫৭
মৃত্যুর থাবা ৫৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৬১
আযাবের ভয়, রহমতের আশা ৬৫
একটি ঘটনা ৬৭
আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কান্না..........৬৮
দ্বীন প্রচারে বাধা আসবেই ৬৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর
আদর্শ থেকে আমরা সরে গেছি ৭১
সাহাবায়ে কিরামগণের ত্যাগ ৭৪
সেদিন আমি একা হয়ে যাব ৭৫
সেখানে কেউ কারও কাজে আসবে না ৭৭
সেদিন ফয়সালা হবে আমাদের ভাগ্যের ৮১
হাশরের আলোচনা...৮২
দুনিয়ার জিন্দেগী ৮৫
কণ্ঠশিল্পী জুনায়েদ জামশেদের ঘটনা ৮৯
সাঈদ আনোয়ারের ঘটনা ৯৩
আসুন, বদলে যাই ৯৪
জালেমরা, সাবধান!...৯৬
সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে ৯৯
পরকালের প্রস্তুতি ১০১
তওবা...১০২
হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনা...১০৪
তওবার একটি ঘটনা ১০৬
তওবার ঘটনা...১০৭
মদ পানকারীর তওবা..১০৮
চল্লিশ বছর নাফরমানী করেও ক্ষমা লাভ........... ....১০৯

চোখের হেফাজতের একটি ঘটনা ১১০
এক শাহ্জাদার তওবা ১১২
এক পাপী যুবকের অন্তিম সময়ের তওবা ১১৫
আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক্কারী! সাবধান ১১৮
শিরিকের পরিচয় ১১৮
সুদখোর! সাবধান ১২০
মুনাফিক! সাবধান ১২১
আসুন গুনাহ ছেড়ে তওবা করি ১২৩
বেকার জীবন ১২৬
প্রিয় বোন তোমাকে বলছি! ১২৮
মুসলিম নারীর ইজ্জত ১৩০
হযরত উম্মে শুরাইক, এক মহিলা সাহাবিয়্যাহ ১৩২
আরেক নারীর ঈমান দীপ্ত জীবন কথা ১৩৪
আমরা মুহাম্মদী উম্মত ১৩৯
ভালবাসা করো, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে ১৪২

প্রশংসার উচ্চতায় প্রভু আমার

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

আপনি বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য যদি সাগরের সব পানি কালি হয়, তাহলে সে সাগর ফুরিয়ে যাবে পালনকর্তার কথা শেষ হবার আগেই। সাহায্যস্বরূপ আরেকটি সাগর এনে দিলেও। (সূরা-কাহাফ, ১০৯)

তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি ছাড়া কোন মালিক নেই। তিনি ছাড়া কেউ খালিক নেই। তিনি রাজ্জাক। তিনি রিযিকদাতা। নিরাপত্তাদাতা তিনিই।

যাঁর সামনে আসমান ঝুকে রয়েছে। নক্ষত্র নুয়ে আছে। পাথরগুলো সিজদারত। তাঁর সামনে পাহাড়গুলো নত রয়েছে। তাঁর সামনে সিজদাবনত সাগর-নদী-খাল-বিল-গাছপালা। পশুপাখি, কীট পতঙ্গ যাঁর জিকিরে মশগুল। যিনি রহীম, রহমান। ওয়াহহাব, রাজ্জাক। মালিকুল-মূলক, যুলজালালি ওয়াল ইকরাম। আরহামার রাহীমীন। আকরামাল আকরামীন, আওয়ালুল আওয়ালীন। আখিরাল আখিরীন। সব বড় বড় গুণের অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) বলেন, একবার ক'জন সাহাবী কোন এক জায়গায় বসে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি সাহাবীদের চিন্তা-ভাবনার বিষয় জানতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা আর গবেষণা করো। তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে ভেবো না। কারণ তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করলে কোন কুল-কিনারাই করতে পারবে না। এ ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। তাঁর মর্যাদা তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না।

তিনি আল্লাহ্। যা ইচ্ছা তাই করেন। এ বিশ্ব জগতে যা কিছু রয়েছে, সব আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি শিল্প। যার সব কিছুই অতি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। আমরা যদি মহান রাব্বুল আলামীনের বিস্ময়কর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে ভাবি, তাহলে আমরা তাঁর বড়ত্ব মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

বুযুর্গ হযরত দাউদ তাই (রহ.) তাই একদিন রাতে নিজের ঘরের ছাদে উঠে আকাশের বিচিত্র কারুকাজ আর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে যান।

এসব ভাবনায় তার হৃদয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। তিনি ব্যাকুলচিত্তে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে ছাঁদ থেকে প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদে পড়ে যান। ছাদে কিছু পতিত হওয়ার আওয়াজে প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রতিবেশী চোর মনে করে তরবারী নিয়ে ছাদে এলেন। এসে দাউদ তাই (রহ.)কে দেখে তিনিতো হতবাক! সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করেন, হযরত! কি হয়েছিল, কিভাবে পড়ে গেলেন? দাউদ তাই উত্তর দেন, জানিনা।

আমরা এ জগতের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাই সব কিছু কি অপার বিস্ময়ে ভরা। হতবাক করা সব সৃষ্টি। দুনিয়ার বিস্ময়কর জিনিস ও বিষয়গুলো এত অগণিত যে, কেউ তা লিখে, বলে শেষ করতে পারবে না। যদি সাগর নদী ও জলাশয়ের সব পানি লেখার কালি হয়। জমিনের সব বৃক্ষ যদি কলম হয়, জগতের সব প্রাণীকুল যদি লেখক হয়। আর অনন্তকাল ধরে যদি মহান রাব্বুল আলামীনের গুণ ও মহিমা লিখতে থাকে, কালি ফুরিয়ে যাবে, কলম ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রাণীকূল লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, তবুও মহান রবের প্রশংসা-মহিমা বিচিত্র সবসৃষ্টি কৌশল ও বিস্ময়কর শিল্প নৈপুণ্যের অল্প কিছুই লিখতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা জমিনকে করেছেন বিছানা। জমিনকে এত চওড়া করেছেন যে কেউ সারা জীবন চলতে থাকলেও তার শেষ সীমায় পৌছতে পারবে না। জমিনের উপর স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্বত দিয়ে পেরেকের মত পুতে দিয়েছেন। যাতে তা নড়াচড়া না করে। আল্লাহ্ তায়ালা কত সুন্দর করে জমিনকে পরিপাটি করে আমাদের জন্য সাজিয়েছেন। জমিন ফেটে যখন চৌচির হয়ে যায়, তখন তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ্টির পানিতে ভিজে শক্ত মাটি কেমন সজিব হয়ে যায়! ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া মরা জমিনে আবার জেগে উঠে সবুজ ঘাস, তরুলতা-গাছপালা। ফসল আর ফুলে ফলে ভরে উঠে চারদিক। নানা রঙের ফল ফুলের শোভায় ভূপৃষ্ঠ হাজার রঙে রঙীন হয়ে উঠে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا

আমি জমিনের যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছি পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্য।

এ জগতে হাজার হাজার ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে হাজার রকমের বৈচিত্র্য দিয়েছেন। এসব নিয়ে চিন্তা করলে আমরা এমন এক অসীম শক্তির সন্ধান পাবো, যে শক্তির সীমা পরিসীমা করতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা-আত্মহারা হয়ে যাবে। সে মহা পরাক্রমশালী সুনিপুণ শিল্পীর অপরূপ আশ্চর্যময় সৃষ্টিকৌশল বুঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

জগতের সব রকম জীব জানোয়ার পশু-পাখি এদের নিয়ে চিন্তা করুন। এদের কিছু মাটির উপর চলে। কিছু আবার ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। আবার কিছু দু'পা-চার পায়ে চলে। কিছু আবার বিশাল বড় বড়। আবার কিছু একেবারে ক্ষুদ্র, এমন ক্ষুদ্র যে চোখেই পড়ে না।

যেমন পোকা, মাকড়, জমিনের নিচে থাকা বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ। এদের আকার আকৃতি, চরিত্র ও জীবন ধারণের নিয়ম আলাদা। এদের জীবন-ধারণ ও আত্মরক্ষার জন্য মহান স্রষ্টা সব কিছুই দান করেছেন।

এ অসংখ্য ছোট বড় জীব জানোয়ার, পশুপাখি, কীট পতঙ্গগুলোর প্রত্যেকের জীবন যাপন পদ্ধতি আলাদা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এরা কি উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করবে। কিভাবে তৈরি করবে বাসস্থান। কিভাবে করবে সন্তান লালন-পালন।

বাবুই পাখির কথা চিন্তা করুন, ছোট্ট একটা পাখি, কি সুন্দর করে তৈরি করে নিজের বাসস্থান। আশ্চর্য নিপুণতার সাথে শৈল্পীক সে বাসা আকাশ ছুই ছুই তালগাছের পাতায়।

মাকড়সার কথা ভাবুনতো, কি অভিনব কৌশলে কর্মক্ষতা আর দূরদর্শিতার সাথে সে তৈরি করে নিজের আবাস।

এসব কিছুই মহান রাব্বুল আলামীনের অপূর্ব মহিমা। কি অসীম তাঁর ক্ষমতা। আমরা বড়ই অলস। বড়ই উদাসীন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সুস্থ সুন্দর দু'টি চোখ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামত রাজি দেখার জন্য। কিন্তু আমরা আমাদের দৃষ্টি আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি নৈপুণ্যের দিকে দেই না। গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতিটা জিনিসে প্রতিটি কণায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম ক্ষমতা, দয়া আর মহিমার যে বিচ্ছুরণ ফুটে উঠেছে, তা দেখার, শোনার, অনুভব করার সময় ও অবকাশ আমাদের মাঝে নেই।

প্রিয় ভাই ও বোন! - মহান রাব্বুল আলামীনের অপরূপ সৃষ্টির নিপুণতা, সৌন্দর্য বৈচিত্রতা, গাম্ভীর্য আর বিশালতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় অন্ত র। যিনি এত সৌন্দর্যময় এতো নিপুণ সৃষ্টিগুলোর স্রষ্টা, তিনি কে সে মহান? তিনি আল্লাহ্। আল্লাহ্। আল্লাহ্। পরম প্রভু। সর্বশক্তিমান। তিনি আমাদের মালিক। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী।

তিনি রহমান, রাহীম, পরমদাতা, দয়ালু। আমরা সবাই তার দয়ার উপর নির্ভরশীল।

আল্ মালিকু-আল্লাহ্ই একমাত্র স্বত্ত্বাধীকারী।

আল্ কুদ্দুসু- আল্লাহ্ যাবতীয় অন্যায় জুলুম ও কোন প্রকার ভুল থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

আসসালামু– তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা।

আল্ মুমিনু– তিনিই একমাত্র নিরাপত্তা প্রদানকারী।

আল্ মুহাইমিনু– তিনিই একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী।

আল্ আযিযু– তিনি মহা সম্মানিত, দুর্দান্ত প্রতাপশালী ও অসীম শক্তিধর বাদশাহ।

আল্ জাব্বারু– তিনি এমন এক বাদশাহ, যা খুশি তাই করতে পারেন।

আল্মুতাকাব্বিরু– সব রকম শক্তি ও গুণের সমাহার আল্লাহ্ তায়ালার।

আল খালিকু– যাবতীয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা।

আল্ বারিউ– রূহ এবং যাবতীয় অদৃশ্যের স্রষ্টা।

আল্ মুসাওয়িরু– তিনি দান করেন আকার আকৃতি।

আল্ গাফ্ফারু– আল্লাহ্ অনেক বড় ক্ষমাশীল।

আল্ কাহ্হারু– প্রভাব বিস্তারকারী, মহাশক্তিধর।

আল্ ওয়াহ্হাবু– তিনি অনেক বড় দাতা।

আর রয্যাকু– আল্লাহ্ই একমাত্র রিযিকদাতা।

আল্ ফাত্তাহু– যিনি খুলে দেন সকল দুয়ার। তার মানে, বিদ্যা বুদ্ধি রুজি-রোজগারের সহ সব নিয়ামতের রাস্তা আল্লাহ্ তায়ালা খুলে দেন। মহা বিজয়ী।

আল্ 'আলিমু– সর্বজ্ঞ। সব বিষয়ে সব কিছুই জানেন। মহাজ্ঞানী।

আল্ ক্বাবিদু– যিনি সংকীর্ণ বা ছোট করেন। হরণকারী।

আল্ বাসিতু– যিনি প্রশস্ত বা বড় করেন। যে কোন অবস্থাকে তিনিই ক্ষুদ্র করেন। আবার তিনিই বড় করেন। তাই আমাদেরকে তাঁর উপরই নির্ভর ও তাঁকেই ভয় করা উচিত।

আল্ খাফিদু– তিনিই অবস্থার অবনতি করেন।

আর রাফিয়ু– তিনিই উন্নতি দান করেন। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতী হাতেই উন্নতি ও অবনতি।

আল্ মুয়িযু– তিনি ইজ্জত দানকারী।

আল্ মুজিল্লু– তিনিই ইজ্জত কেড়ে নেন। অপদস্ত তিনিই করেন। তাই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সম্মান চাওয়া। অসম্মান থেকে আল্লাহ্ যেন বাঁচিয়ে রাখেন, এ দোয়া করা।

আস সামীউ– যিনি সবকিছুই শোনেন।

আল্ বাছিরু– সব কিছুই দেখেন।

আল্ হাকামু– আল্লাহ্ই একমাত্র আদেশ দানকারী, আইন প্রণেতা। মহা বিচারক।

আল্ আদিলু– আল্লাহ্-ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক।

আল্ লাতীফু– আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও বিপদে মুক্তিদাতা।

আল্ খাবিরু– যিনি গোপন খবর জানেন।

আল্ হালিমু– তিনি অতিশয় ধৈর্যশীল ।
আল্ আযীমু– তিনি অতি মহান ।
আল্ গাফুরু– তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ।
আশ্ শাকুরু– তিনি সঠিক কর্মসম্পাদনকারী । কৃতজ্ঞতাপ্রিয় ।
আল্ আলিয়্যু– আল্লাহ্ বড় মহান । মহা উন্নত ।
আল্ কাবীরু– তিনি সবচেয়ে বড় ।
আল্ হাফিজু– তিনি সবকিছু সংরক্ষণ করেন ।
আল্ মুক্বিতু– মহাশক্তিদাতা
আল্ হাসীবু– তিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী ।
আল্ জালীলু– তিনি অতিবড় মর্যাদাশীল ।
আল্ কারীমু– তিনি বড় দাতা । অনুগ্রহশীল ।
আল্ রাকীবু– তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন । মহা পর্যবেক্ষক ।
আল্ মুজীবু– প্রার্থনা শ্রবণকারী । কবুলকারী ।
আল্ উয়াসিউ– তিনি বিশাল ।
আল্ হাকীমু– তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ।
আল্ ওয়াদূদু– তিনি প্রেমময় ।
আল্ মাজীদু– তিনি সবচেয়ে সম্মানিত ।
আল্ বাঈসু– তিনি কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থানকারী ।
আশ শাহীদু– প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদাতা ।
আল্ হাক্কু– তিনি মহাসত্য ।
আল্ ওয়াকিলু– তিনি একমাত্র কার্য নির্বাহক ।
আল্ ক্বাবীউ– তিনি প্রবল পরাক্রমশালী ।
আল্ মাতীনু– দৃঢ় শক্তির অধিকারী ।
আল্ ওয়ালিয়্যু– তিনি একমাত্র বন্ধু ।
আল্ হামিদু– তিনি প্রশংসারযোগ্য ।
আল্ মুহ্সিয়্যু– তিনি হিসাব সংরক্ষণকারী ।
আল্ মুবদিউ– তিনি সৃষ্টির সূচনাকারী ।
আল্ মুয়ীদু– তিনি পুনরুত্থানকারী স্রষ্টা ।
আল্ মুহিউ– তিনি জীবন দাতা ।
আল্ মুমিতু– তিনি মৃত্যুদাতা ।
আল্ হাইয়্যু– তিনি চিরঞ্জীব ।
আল্ ক্বাইয়্যুম– তিনি চিরস্থায়ী ।
আল্ ওয়াজিদু– তিনি ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী ।
আল্ মা-জিদু– মহা গৌরবান্বিত ।

আল্ ওয়াহিদু– তিনি এক।
আস সামাদু– তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।
আল্ কাদীরু– তিনি শক্তিমান।
আল্ মুকতাদীরু– তিনি সর্বশক্তিমান।
আল্ মুকাদ্দিসু– তিনি অগ্রগামী করেন।
আল্ মুয়াখখিরু– তিনি পেছনে ফেলে দেন।
আল্ আউয়ালু– তিনি অনাদি।
আল্ আখিরু– তিনিই অনন্ত।
আয যাহিরু– তিনি প্রকাশ্য।
আল্ বাতিনু– তিনি গোপন।
আল্ ওয়ালী– তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ।
আল্ মুতাআলী– তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। চির উন্নত।
আল্ বাররু– তিনি পরম বন্ধু।
আত্ ত্বাওয়াবু– তিনি তওবা কবুলকারী।
আল্ মুনতাকীমু– তিনি শাস্তিদাতা।
আল্ আফুয়্যু– তিনি ক্ষমাশীল।
আর রাউফু– তিনি অতিশয় সদয়।
মালিকুল মূলক– তিনি বিশ্ব জাহানের মালিক।
যুলজালালি ওয়াল ইক্‌রাম– তিনিই সব প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক।
আল্ মুকসিতু– তিনি ন্যায়-বিচারক।
আল্ জামিউ– তিনি সমবেতকারী।
আল্-গানিয়্যু– তিনি প্রকৃত ধনী।
আল্ মুগনীয়্যু– তিনি ঐশ্বর্যদাতা।
আল্-মানিউ– তিনি প্রতিরোধকারী।
আদ্ দার্‌রু– অনিষ্টের মালিক।
আন নাফি'উ– তিনি লাভ দানকারী।
আন নূরু– তিনি আলো।
আন্ হাদিউ– তিনি সৎপথ দেখান বা হিদায়াত দান করেন।
আল্ বাদিউ– তিনি প্রথম অস্তিত্ব দানকারী।
আল্ বাক্বী– তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন।
আল্ ওয়ারিসু– তিনি সকল কিছুর একমাত্র সত্বাধিকারী।
আর রাশিদু– তিনি সত্য পথে পরিচালনাকারী।
আস-সাবিরু– তিনি ধৈর্য্যশীল।
আস-সাত্তারু– তিনি দোষ গোপন করেন।

আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি দেখে ফেরেশতাগণের বিস্ময়!

মহান রাব্বুল আলামীন যখন জমিন সৃষ্টি করেন, তখন জমিন কাঁপছিল। তাকে স্থির করার জন্য আল্লাহ পাক পাহাড়কে পেরেকের মত পুতে দেন।

এ পাহাড় দেখে ফেরেশতাগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারা বলে, হে আল্লাহ্! আপনি এর চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন উত্তর দেন, হ্যা, করেছি। সেটি হল লোহা।

ফেরেশতাগণ বলে, লোহা কি কারণে এ পথুড়ে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী।

আল্লাহ্ পাক বলেন, লোহা দিয়ে পাহাড়কে কেটে টুকরো টুকরো করা যায়।

ফেরেশতাগণ বলে, এ লোহার চেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাবান কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা, করেছি। তা হল আগুন।

আগুন লোহাকে গরম করে পানির মত তরল করে দেয়। রহিত হয়ে যায় লোহার ক্ষমতা।

হে, আল্লাহ্! আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কিছু কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা করেছি। আর তা হলো পানি। পানি দিয়ে আগুনকে নিভিয়ে ফেলা যায়।

হে, আল্লাহ্! পানির চেয়ে শক্তিশালী কিছু কি সৃষ্টি করেছেন?

হ্যা, করেছি, তা হলো বাতাস। বাতাস পানিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারে।

বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা করেছি, আকাশ। সে সবার উপরে। বাতাস একে স্পর্শ করতে পারেনা।

ফেরেশতাগণ আবার জানতে চায়, হে আল্লাহ্! আকাশের চেয়ে শক্তিশালী কিছু কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা আছে, আর তা হলো তোমরা। ফেরেশতাগণ বিস্মিত! আমরা?

আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা, তোমরা।

ফেরেশতাগণ বলেন, আমাদের কি গুণাগুণ?

আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা আমার অনুগত। অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সম্মানিত, শক্তিধর, বিক্রমশালী। তোমাদের সরদার জিব্রাঈল আমীন যদি একটা চিৎকার দেয়, তাহলে জগতের সমস্ত প্রাণীর হৃদয় ফেটে যাবে। মারা যাবে। তার পাখার একটি কোণের আঘাতে পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের নূর যদি জগতে পড়ে তাহলে জগতের সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

আমি যদি তোমাদের আদেশ করি, তোমরা সানন্দে তা মেনে নাও। তোমরা পাপ করনা। তোমরা নিষ্পাপ। শুধু আমার হুকুম তামিল করো।

ফেরেশতাগণ কৃতজ্ঞচিত্তে বলে, তাহলে কি আমাদের থেকে শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ কাউকে আপনি সৃষ্টি করেননি?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হ্যা, আছে।

ফেরেশতাগণ বলে, কি সে জিনিস?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, মানুষ।

বিস্মিত ফেরেশতাগণ! মানুষ আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ! কি মহাত্ম তাঁদের? কি তাঁদের গুণাগুণ? কেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তারা আমার অনুগত। আমার বাধ্য। ফেরেশতাগণ বলে, আল্লাহ্, তারাতো গুনাহ করবে। আল্লাহ্ পাক বলেন, তারা গুনাহ করবে, ক্ষমাও প্রার্থনা করবে।

তখন তাদের গুনাহ মাফ হবে। তারা কাঁদবে। অনুতাপের অশ্রু ঝরাবে আমি মাফ করে দেব।

ফেরেশতাগণ বলে, তাদের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, মালিক ও গোলামের। প্রভুও বান্দার। মনিবও ক্রীতদাসের।

ফেরেশতাগণ বলে কিসে তারা বড়?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তারা আমার প্রেম ভালবাসায় জান কুরবান করবে। তারা আমার সবচেয়ে আপন।

ফেরেশতাগণ বলে, কেন, আমরাইতো আপনার অনুগত। একজনও বিদ্রোহী নেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশইতো বিদ্রোহী।

আল্লাহ্ পাক বলেন, তবুও তারা বড়। কারণ তাদের অন্তরে গেঁথে রয়েছে এমন এক বিশ্বাস।

ফেরেশতাগণ বলে, কি সে বিশ্বাস?

আল্লাহ্ পাক বলেন, তারা বিশ্বাস করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কে আমি, কি আমার ক্ষমতা, সব তারা বিশ্বাস করে।

ফেরেশতাগণ বলে, শুধু বিশ্বাসের জন্য তারা এত বড়। তারা শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ্ পাক বলেন, হ্যা, শুধু এ বিশ্বাসের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাসের আলো প্রজ্জ্বলিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সবার চেয়ে সেরা।

তোমরা আমাকে দেখো। আমার অস্তিত্ব কাছে থেকে দেখে বিশ্বাস করো। কিন্তু মানুষ শুধু অনুভব করে আমাকে বিশ্বাস করে। আমার ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আমার খুশির জন্য নেক আমল করে। সুবহানাল্লাহ্!

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ وَّيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۚ

জমিনে যা কিছু আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু থাকবে মহান রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব। (সূরা আর রাহমান, আয়াত ২৬-২৭)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার!

এ পৃথিবীতে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বান্দা হিসেবে। এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো সমগ্র সৃষ্টি জগতের মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা। সৃষ্টি জগতের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার পয়গাম পৌছে দেয়া। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা এতই ভয়াবহ যে, তাঁর কথা আমরা ভুলে যাই। আমরা আজ দুনিয়াবী কাজে এতটাই মশগুল যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করার চেয়ে নিজেদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত। কেউ নিজের সম্পদের বড়াই করে বেড়ায়। কেউ নিজের রূপ গুণের প্রশংসা করে বেড়াই। অথচ বিষয়টাতো এমন ছিল প্রতিটা মুসলমানের কর্তব্য ছিল আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা। আল্লাহ্ তায়ালার পথে জীবন যাপন করা। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করা। কিন্তু আমরা তাঁর অবাধ্য হচ্ছি। তাঁর সাথে অন্যকে শরিক করছি। কেউ জেনে কেউ না জেনে শিরক করছে। কুফরী করছে। অথচ আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য। আল্লাহ্ তায়ালার গোলামী এবং পৃথিবী ব্যাপী আল্লাহ্ তায়ালার আমানত পৌছে দেয়া। এ উদ্দেশ্যেই তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সব কৃতকর্মের হিসাব রাখছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে। একটি একটি করে। তাঁকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালা ভুলেন না। আমরাতে মিনিটে মিনিটে ভুল করি। পকেটে কিছু রাখলেও ভুলে যাই। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন তো সব রকমের বিস্মৃতির উর্ধ্বে।

আমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়ে সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড় করানো হবে। সেদিন আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা দুনিয়াতে কি করে এসেছো? সেদিনের অবস্থা হবে বড়ই করুন ও ভয়াবহ।

সেদিনের পেরেশানী যুবককে পরিণত করবে বৃদ্ধে। আর মা তার দুধের শিশুকে ফেলে নিজে বাঁচতে চাইবে। মা বলবে, আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করো। পিতা পুত্রকে ভুলে যাবে। সেখানে সবাই একাকি থাকবে। অসহায় থাকবে।

নিজের মুক্তির চিন্তায় এমন ব্যাকুল থাকবে যে, মা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না। ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেউ কারও কাজে আসবে না। একমাত্র নিজের আমল ছাড়া।

কোরআনে পাকে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত রয়েছে বিচার দিন। (সূরা নাবা–১৭)

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ

يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ— كَلَّا لَا وَزَرَ

সেদিন মানুষ বলবে, পালানোর জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (সূরা কিয়ামাহ ১০-১১)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন তোমাদের এ অবস্থায় হাজির করা হবে। তোমাদের কিছুই আজ গোপন থাকবে না। (সূরা হাক্কাহ-১৮)

মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি আমরা পালন করছি? আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথে আমরা কতটুকু হাটছি? পথতো একটিই। সিরাতে মুস্তাকীমের পথ। যে পথটি সোজা চলে গিয়েছে জান্নাতের দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যেন আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য না হই। আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধকে ভয় করি। সমস্ত পাপ কাজ থেকে নিজেকে বাচিয়ে জান্নাতের পথে চলি।

কিন্তু আমরা এতটাই নির্বোধ যে, আমরা বারবার প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতাকে গ্রহণ করছি। সদা ডুবে আছি মদ-জুয়া আর অবিচারে। সুদ ঘুষের টাকায় গড়ছি সম্পদের পাহাড়। গান বাদ্যে মশগুল হয়ে পার করছি দিনের পর দিন। ভুলে যাই তাঁর ক্রোধ, তাঁর গজবের কথা। যা আমাদের পাপের কারণে আমাদের উপর আছড়ে পড়তে পারে যে কোন সময়। আবার বিপদে পড়লে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আকুতি জানাই। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করো। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে যেসব অন্যায় কাজ থেকে বিরত

থাকতে বলেছেন। মুহূর্তের জন্যও তা থেকে বিরত হই না। একবারও তো ভাবিনা, এ অবাধ্যতা, এ অন্যায় আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? জান্নাতের কথা ভাবিনা। জাহান্নামের কথা ভাবিনা। মৃত্যু কবর হাশর। কবরের আযাবের কথা ভাবিনা। ভুলে যাই কবরের একাকিত্ব। ভুলে যাই হাশরের দিনের ভয়াবহতা। বিচার দিনের অসহায়ত্ব। ভাবিনা হাশরের দিনে আমার আমলনামা ডান হাতে থাকবে না বাম হাতে?

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তায়ালা যখন বলবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

হে অপরাধী সম্প্রদায়! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন-৫৯)

সেদিন আমি কোন দলে থাকব? অপরাধীদের কাতারে, নাকি সৎ ও নিরপরাধীদের কাতারে?

আমাদের চোখের সামনে কত প্রিয়জন, কত চেনা মুখ অসংখ্য ধন-সম্পদের মালিক আজ কবরের বাসিন্দা। কিন্তু তাদের দেখে আমরা সামান্যতম শিক্ষাও গ্রহণ করিনি। পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিনি। অথচ সেদিন একটি নেক আমলের জন্য মানুষের অসহায়ত্বের কোন সীমা থাকবে না।

যারা এক সময় বড়ই শান শওকতের সাথে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে, তাদের কবরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, একসময় তোমার সামনে পৃথিবীর শক্তিশালী বাহাদুরও মাথানত করে দাঁড়িয়ে থাকতো। হাতজোড় করে তোমার করুণা চাইতো, আজ তুমি কেনো মাটির নিচে পড়ে রয়েছো? তোমার কবরে আজ মাকড়শার জাল?

কোনো সুন্দরী সম্রাজ্ঞীর কবরের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তুমি তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলে, গোলাবের পানি দিয়ে তুমি গোসল করতে? শত শত দাসী বাদী তোমার খিদমত করতো। আজ কেন তোমার হাড়গুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে? কবরবাসী জবাব দেবে না। নিজেকে জবাব খুঁজে নিতে হবে। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতকতা আর কত কাল?

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমাদের পাপের ফসলতো বৃদ্ধি করেই চলেছি। জীবনের মূল্যবান সময়গুলো আমরা কত অবহেলায় ব্যয় করছি। হারাম কামাইয়ের জন্য আমরা কত কষ্ট করছি। অথচ এ কষ্টের বিনিময়ে ক্রয় করছি পরকালের আযাব। যে

আযাব সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা কেনো ভাবিনা, মৃত্যু আমাদের হবেই। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য কেন আমরা পরকালকে বরবাদ করছি? শেষ বিচারের দিনে যেখানে নবী অলি আবদালগণও নিজেকে নিয়ে পেরেশান থাকবেন। সেখানে আমরা গুনাহের পাহাড় গড়ে কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে হাজিরা দেব?

আমাদের কি হুশ হবে না? আমরা আর কত কাল হারামের পথে ছুটবো? আর কতকাল দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতায় কাটাবো? আমরা আর কতকাল আমার শরীর আমার মনের চাহিদার জন্য নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের উপযুক্ত করতে থাকব? আমরা কি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধের ব্যাপারে যত্নবান হব না? আমরা কি অভিশপ্ত শয়তানের ফাঁদ ভেঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালার বিশ্বস্ত হবো না?

আমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেই, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা খুশি হন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার প্রতি তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল করতে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও বরকত যে জীবনে আছে, সে জীবনের চেয়ে সুখি সুন্দর জীবন কি আর হতে পারে? না হতে পারেনা। আর কেউ যদি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাহলে তার আর বিপদের শেষ থাকে না। শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করা মানে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। আর আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়া।

আজ সারা দুনিয়ার যে দিকে চোখ যায় শুধু চোখ ঝলসানো আলোর মেলা। চারদিকে শুধুই আনন্দ ফুর্তির আওয়াজ। কিন্তু অন্তরগুলো আঁধারে ভরপুর। আনন্দ ফুর্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে কান্না আর হতাশা। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে যে হৃদয়ের সখ্যতা নেই সে হৃদয়তো হতাশায় ভরপুর থাকবেই। আজকে জগতে মানুষ ও মানবতা বড় দুঃখে দিনাতিপাত করছে, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তাদের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে।

বলুনতো! এটা কি কোন বাদশাহী হল যা ধুলোয় মিশে যায়? যে উন্নতি একসময় অবনতি হয়, তাও কি কোন উন্নতি? মৃত্যু যে জীবনকে শেষ করে দেয় তা কি কোন জীবন হলো? যে যৌবনকে বার্ধক্যে গ্রাস করে, তা কি কোন যৌবন হল? যে আনন্দ ফুর্তির পেছনে বেদনা লুকিয়ে আছে, তা কি কোন আনন্দ হলো?' যে সম্পদ ফুরিয়ে যায় তা কি কোন সম্পদ হলো? যে সুস্থতার পেছনে অসুস্থতা আছে তা কি কোন সুস্থতা হলো? যে ভালবাসার পেছনে লুকিয়ে থাকে

ঘৃণা, তা কি কোন ভালবাসা হলো? অথচ এগুলোর জন্যই ছুটে চলেছি উর্ধশ্বাসে।

আল্লাহ্ আমাদের মাফ করুন। পৃথিবী তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবমান। শেষ বিচারের দিন আসছে। মিমাংসার দিন আসছে। সেদিন দলে দলে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমাদের হাজির করা হবে। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন নিজে বিচারক থাকবেন। আমাদের আমল অনুযায়ী মীমাংসা করবেন। সেদিনটির সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি একটিই, যে নিজেকে পবিত্র করে নিজের নেক আমলের পাল্লা ভারি করে নিল, সে সফল। আর যে ব্যক্তি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের জিন্দেগীকে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ।

আমরা লুণ্ঠিত মুসাফির।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন আমার!

কেমন নিঃস্ব আমরা। ফকিরের ও অধম, ফকিরের তো একটি থলে থাকে, যাতে সে তার কামাই জমা রাখে। আমাদের কি আছে? আখিরাতের সম্বলতো শূন্য। কি নিয়ে হাজির হবো আল্লাহ্ তায়ালার সামনে? দুনিয়ার সম্পদ তো কাজে আসবেই না, বরং তা আমার জন্য বিপদের কারণ হবে। কত বদ নসিব আমাদের। কত হতভাগ্য আমরা যে, এ জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও আল্লাহ্ তায়ালার মোহাব্বতে আদায় করিনি। কত নামাযইতো পড়লাম, একটি সিজদাও কি কবুল হয়েছে কিনা জানা নেই। আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে সিক্ত হয়ে সিজদাগুলো আদায় তো করতে পারিনি। এরপরও আমরা উৎফুল্ল, এ ভেবে যে, আমরা নামায পড়ি। কোথায় আমাদের নামাযের রেজাল্ট? নামাযই যদি পড়ি তাহলে আমি গুনাহ ছাড়তে পারছি না কেন? আল্লাহর্ ওয়াস্তে, আমার ভাই বোনেরা! আমার কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করুন। আমি নিজেইতো সে গন্তব্যে পৌছতে চাই। সে গন্তব্যটা হলো জান্নাত। সে পর্যন্ত পৌছতে আমাদের লুট হয়ে যাওয়া ঈমানকে তাজা করতে হবে। যে জীবন আমরা অবলম্বন করছি, সে জীবন থেকে তওবা করতে হবে। ফিরে আসতে হবে সে পথ থেকে যে পথে আমরা হাটছি।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমরা সর্বহারা পথিক। আমরা লুণ্ঠিত মুসাফির। আমরা আমাদের গন্তব্য হারিয়ে ফেলেছি! মন মগজ দুনিয়ার নেশায় আচ্ছন্ন। তাইতো, কোরআন

পড়েও তা আমাদের আত্মায় প্রবেশ করে না। কোরআন শুনেও আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন জাগেনা। নামাযে দাঁড়িয়ে অন্তরকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে জুড়ে দেই না। সিজদায় পড়েও আল্লাহ্ তায়ালার কথা স্মরণে আসে না। আমাদের চেয়ে লুণ্ঠিত মুসাফির আর কে আছে?

আজ তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীর পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পথহারা লুণ্ঠিত মুসাফিরদের ফিরিয়ে আনতে। ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাতো আল্লাহ্ তায়ালার। আমরা তো উছিলা মাত্র। আমরা যা হারিয়েছি, এর সন্ধান করছি। জানিনা, কখন মৃত্যু এসে যায়? যদি এ নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়, তাহলে বড় বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। একদম খালি নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার সামনে কিভাবে দাঁড়াব? একটি সিজদাও তো পুজি নেই, যা আল্লাহ্ তায়ালার সামনে পেশ করবো। আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখাতে পারবো যে, আল্লাহ্ দেখো এ একটি সিজদাই আমার সম্বল। যা আমি তোমার প্রেমে সিক্ত হয়ে করেছিলাম।

সেদিন কত মানুষ কত নামায রোযা নিয়ে হাজির হবে। কত আমলের পাহাড় তাদের সাথে থাকবে। আর আমার থাকবে পাপের স্তুপ। আমার কি হবে সেদিন? মৃত্যু তো নেই, যে মরে শেষ হয়ে যাবো। লুকাবার এমন কোন স্থানতো পাব না। যে আড়াল হয়ে যাব। সেদিন চরম বিপদগ্রস্থ থাকব আমরা।

একটি ঘটনা :

হযরত আবু আলী দাককাহ (রহ.) বলেন,

আমাদের সময়ের একজন বুযুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখার জন্য গেলাম। তখন তাঁর খানকায় হাজার হাজার শিষ্য উপস্থিত ছিল। তিনি কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রিয় শায়খ! আপনি কাঁদছেন কেন? এ অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া মোহাব্বতে কি আপনি কাঁদছেন?

শায়খ উত্তর দেন। না আমি দুনিয়ার মায়া মোহাব্বতে দুনিয়ার বিচ্ছেদে কাঁদছি না। বরং আমি আমার নামাযের বিফলতায় কাঁদছি। আমার জীবনের সমস্ত নামায আমি নষ্ট করে ফেলেছি। শায়খের কথাশুনে আমি বিস্মিত হয়ে যাই।

বললাম, প্রিয় শায়েখ! এটা কিভাবে সম্ভব? আপনিতো সারা জীবন নামায আদায় করেছেন। শায়খ বলেন, হ্যা, আমি জীবনে যত নামাযই পড়েছি, সিজদা করেছি, সিজদা থেকে মাথা তুলেছি, সব সময়ই আমার অন্তরে গাফলতি ও অবহেলা ছিল। একাগ্রতার সাথে আমি রুকু সিজদা করতে পারিনি। আর

আজকে আমার এ অবস্থায়ই মৃত্যু হচ্ছে। এতটুকু বলে তিনি লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে কয়েকটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করেন। সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে,

হায়! হাশরের দিন আমার কি অবস্থা হবে?

সে বিষয়ে ভেবে আমি উদ্বিগ্ন, হতাশ। দুনিয়ার ভোগ বিলাস, ইজ্জত সম্মানের জীবন আমার। একাকি কবরের কি অবস্থায় থাকবো অন্ধকারে? আমি অতি উত্তমরূপে ধ্যান করেছি, যখন আমলনামা আমার হাতে আসবে। তখন না জানি আমার কি দুর্দশা হয়! আয় আল্লাহ্! আয় পরওয়ারদিগার! একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা। আমার আশা। আপনার দয়াও রহমত ছাড়া আমার কোনই গতি নেই। দয়া করে আমাকে আপনি মাফ করে দিন।

দেখুন, একজন আল্লাহ ওয়ালার যদি ইবাদত নিয়ে এমন পেরেশানী থাকে, তাহলে সে তুলনায় আমরা কোথায় আছি?

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমরা আজ উর্ধ্বশ্বাসে জাহান্নামের দিকে ছুটছি। চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। পাপের বোঝা শুধু ভারি করছি। আজ আমাদের সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেকোন সময় আমাদের ধাক্কা দিতে পারেন। আযাব ও গজব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। কারণ, আমরা আমাদের জিন্দেগী পাপ পঙ্কিলতায় ভরে ফেলেছি। পাপ করতে করতে রাতে শুই। পাপের মাধ্যমে দিন শুরু করি। রাত-দিন ডুবে থাকি পাপের মধ্যে। আযাবের ভয় অন্তরে আসে না। তাই তওবার খেয়ালও হয় না। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালার গজবের ভয় যদি অন্তরে আসতো, তাহলে তওবার সুযোগ হতো।

হায়! আজ আমাদের পাপে ভরা জীবন নিয়ে কোন ভয় নেই, আফসোস, অনুশোচনা নেই। আনন্দফুর্তি করে দিন পার করছি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ নাফরমানী তাঁর না শোকরী কতদিন সহ্য করবেন? এ জমিন আল্লাহ্ তায়ালার। এ জমিনে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী সহ্য করবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বযুগের যেসব অবাধ্য জাতিকে পাকড়াও করেছিলেন, তা তাদের অবাধ্যতার কারণে। আসুন ভাই, আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা পরিহার করি। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগত গোলাম হয়ে যাই। আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের শতভাগ মুখাপেক্ষী। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও অনুকম্পা আমাদের প্রয়োজন। আল্লাহ্ যদি তাঁর ব্যবস্থাপনাকে সামান্যতম এদিক সেদিক করে দেন তাহলে আমাদের বিপদের কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

এ সুন্দর পৃথিবী একদিন ছাড়তে হবে। সবার জন্য একই নিয়ম। বাদশাহ্, সম্রাট সম্রাজ্ঞী, পাহলোয়ান, ধনী, গরিব, সুশ্রী, কুশ্রী এককথায় সবাইকে এ জগতের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। কেউই থাকতে পারেনি। কবরস্থানে গিয়ে দেখুন প্রতিদিন কত মানুষের দুনিয়ার সফর শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার কবরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। এ আমি কি করছি? এ কবরে কত পরিচিত স্বজন শুয়ে আছে। আমার ঠিকানাও তো এটাই। হযরত উমর (রাযী.) বলেছেন, মানুষের মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

ভাই ও বোন!

কখন যে কার ডাক এসে যায়, জানা নেই। আল্লাহ্ না করুক। গুনাহরত অবস্থায় যদি কেউ মৃত্যুর শিকার হয়। তাহলে উপায় কি হবে? এরকম তো ভাই হচ্ছে। কতজনের কথা আমি জানি যে, গুনাহরত অবস্থায় মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এইতো সেদিন এক নওজাওয়ানের কথা শুনলাম, সে নাইটক্লাবে আসা যাওয়া করতো। একদিন আনন্দ ফুর্তির সাথে মদ বেশি পান করে ফেলেছিল। এরপর সে অজ্ঞান হলো, আর দুনিয়ার মুখ দেখেনি। মৃত্যুর শিকার হয়েছে। ভাই! এসব কথা মনে হলে ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠে। গলা শুকিয়ে যায়। এত কিছুর পরও আমরা সতর্ক হচ্ছি না। শিক্ষা গ্রহণ করছি না।

প্রিয় ভাই ও বোন!

দুনিয়ার সফর কয়দিনের? দশ, বিশ-ত্রিশ চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, বা একশত বছরের। এরপর? জীবনতো চিরস্থায়ী নয়। ক্ষণস্থায়ী। একশত বছর কি কোন সময় হলো? একটি বছর শেষ হলে আমার কবরের যাত্রা একটি বছর এগিয়ে এলো। তাহলে কিসের এতো আশা ভরসা? কিসের এত চাহিদা। চাহিদা তো আমার শেষই হয় না। বাড়ি-গাড়ি ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয়েও আমার চাহিদা শেষ হয় না। বলুনতো এ সম্পদ কি আমার সাথে কবরে যাবে? যাবেনা। অথচ এর জন্য কত শ্রম, সাধনা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, সুদ ঘুষ সবই কবুল করতে হয়। আর এসব কারণে পরকালের পুঁজির কথা খেয়ালই থাকে না। পরকালের পুঁজি যে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। সে কথা ভুলে গেছি। সেদিন যখন আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলাম, তুমি কি করে এসেছো? কি জবাব দেবো?

আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতিদের ডাক দেবেন,

يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ

হে জান্নাতের অধিবাসীরা!

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ

তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করে এসেছো? তারা বলবে-

لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।
ষাট সত্তর বছর নয়, বলবে মাত্র একদিন, বা এরও কম।
তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন,

نِعْمَ مَا اَجَرْتُمْ فِيْ يَوْمٍ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

একদিন বা অর্ধদিন সময়ে তোমরা কত উত্তম সওদা করেছো? এর বিনিময়ে তোমরা আমার জান্নাত নিয়ে নিয়েছো।

رَحْمَتِيْ وَكَرَامَتِيْ وَجَنَّتِيْ

তোমরা অর্ধেক দিনের কষ্টের বিনিময়ে আমার জান্নাত অর্জন করেছো। আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছো। আমার মেহমানদারী অর্জন করেছো। যাও মজা করো। তোমরা আর মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা বৃদ্ধ হবে না, কখনও পেরেশান হবে না, তোমরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পেয়েছো।

এরপর আল্লাহ্-তায়ালা জাহান্নামীদেরকে ডাক দেবেন।

يَا اَهْلَ النَّارِ

হে জাহান্নামের অধিবাসীরা!

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ

দুনিয়াতে তোমরা কতো দিন অতিবাহিত করে এসেছো?

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

একদিন বা এর কিছু অংশ।
আল্লাহ্ বলবেন,

بِئْسَ مَا اَجَرْتُمْ فِيْ يَوْمٍ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

একদিন বা অর্ধ দিনে তোমরা কত মন্দ সওদা করেছো।

হে জাহান্নামীরা! সামান্য সময়ে তোমরা কত নিকৃষ্ট সওদা করে আমার কাছে এসেছো? কি ভুলই না তোমরা করেছো। সামান্য সময়ে তোমরা আমার অবাধ্যতার কারণে আমার ক্রোধ আর জাহান্নামের আগুনকে ক্রয় করে এসেছো। যাও, চিরকাল সেখানেই অবস্থান করতে থাক। আনন্দ ভুলে যাও।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

ফিরে আসুন জান্নাতের পথে। এ পথে একবার হেটে দেখুন। ভুল পথে আর কত? দ্বীনের পথে চলার স্বাদটা একবার চেখে দেখুন। দেখবেন, এ পথে কত আনন্দ, কত প্রশান্তি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

ফিরে এসো জান্নাতের পথে

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্রতাকে ভালবাসেন। সে পবিত্রতা আমাদের মাঝে নেই, হারিয়ে গেছে। আমাদের মাঝে আজ সংস্কৃতির নামে চলছে অশ্লীলতা। গান বাজনার নামে অশ্লীলতা সব খানে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের মাঝে প্রবেশ করেছে নির্লজ্জতা।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন, হে বান্দা! তোমরা গান-বাজনা ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদের কানগুলোকে বাচিয়ে রাখো। বাইজিদের নাচ দেখা থেকে নিজেদের চোখকে বাচিয়ে রাখো। আমি তোমাদেরকে জান্নাতে হুরদের এমন নাচ দেখাবো, এমন গান শোনাবো, যে দশ লাখ বছর শুনলেও তোমার মাঝে বিরক্তি আসবে না। আজ আমরা গান বাজনা ও নাচের আসর জমাই, অশ্লীলতাকে টাকা দিয়ে ক্রয় করি। এ কাজে টাকা দেয়ার অর্থ হলো গুনাহ ক্রয় করা। আল্লাহ্ তায়ালাকে নারাজ করি। ভাবিনা কত বড় নাফরমানী আমরা করছি। কত বড় অবাধ্যতা টাকা দিয়ে ক্রয় করছি।

আরে ভাই, নাচ গান তো জীবনে অনেক উপভোগ করলে, রাতে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সিজদা দিয়ে চোখের পানি ফেলে দেখ, কত আনন্দ, কত মজা। নাচ গানের মধ্যমণি হয়েতো চোখের মজা অনেক নিয়েছো। একবার আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়ে দেখনা, তাতে কতো স্বাদ। রাতভর নাইট ক্লাবে আর টিভির সামনে বসে না থেকে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে দেখ অন্তরে প্রশান্তি এসে যাবে।

এটা এমন প্রশান্তি, এমন স্বাদ, যা দুনিয়ার সমস্ত স্বাদকে বিলীন করে দেবে। দৃষ্টি অবনত করায় যে স্বাদ আছে, দৃষ্টি তুলে তাকানো সে তুলনায় কিছুই না। নির্লজ্জতার মজাতো অনেক দেখেছো, লজ্জাশীলতার চাদর পড়ে দেখ। দেখবে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের দরজা খুলে যাবে।

বান্দা যখন রাতের জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যায়, সিজদায় গিয়ে অনুতাপের অশ্রু ফেলে আল্লাহ্ তায়ালাকে ডাকে; তখন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলতে থাকেন, দেখো আমার এ বান্দা দুনিয়ার কত আনন্দ ফূর্তি ত্যাগ

করে আমার দরবারে মাথা ঠুকছে, অথচ এ সময় কত মানুষ নাচ গানের আসরে বসে আছে। অনুতপ্ত হৃদয়ে যে চোখ কাঁদে, সে কান্নার এক ফোটা পানি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অনেক প্রিয়।

ভাই ও বোন! এ হৃদয়তো আল্লাহ্ তায়ালার দান। তার ভয়েই তো কাঁদতে হবে। তার রহমত ও বরকতের জন্যই তো এ হৃদয় ব্যাকুল থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালার কসম করে বলছি। আল্লাহ্ সাক্ষী। আপনার হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তায়ালার প্রেম না থাকে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য যদি আপনার কাছে মওজুদ থাকে, তাহলেও আপনার আত্মা শান্তি পাবেনা। মানুষের অন্তরে যে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে! আল্লাহ্ তায়ালার প্রেম ছাড়া সে আগুন নেভানো যাবে না। এ আগুন জ্বলতেই থাকবে। বাড়তেই থাকবে। এ পেরেশানী, এ অস্থিরতার একমাত্র চিকিৎসা হলো তওবা করে আল্লাহ্ তায়ালার পথে ফিরে আসা। আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানি থেকে তওবা করা। আসুন তওবার পথে। বান্দার তওবা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অনেক পছন্দনীয়।

যখন বান্দা গুনাহ থেকে তওবা করে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা অনেক খুশি হন। দুনিয়াতে হারিয়ে যাওয়া সন্তান ফিরে পেলে মা অনেক খুশি হয়। বাবা খুশি হয়। অনেক খুশি হয়, খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করে। আর আল্লাহ্ তায়ালা তওবাকারী বান্দাকে পেয়ে আরও বেশি খুশি হন। আল্লাহ্ বান্দাকে মায়ের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। অথচ আমরা আল্লাহকে নারাজ করছি। আসুন আল্লাহ্ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنِّي لَكَ مُحِبٌّ

হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ভালবাসি। কাজেই তুমিও আমাকে ভালবাস।

يَا ابْنَ آدَمَ أَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِي

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখি, আর তোমরা আমাকে ভুলে যাও?

আমি তোমার পাপকে গোপন করি। আর তুমি আমার অবাধ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি করে চলেছো?

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোনেরা!

আসুন আমরা আল্লাহ্ তায়ালার পথে ফিরে আসি। আল্লাহ্ তায়ালাকে রাজি ও খুশি করা অনেক সহজ। তিনি রহমানুর রাহিম।

ভাই! আল্লাহ্ তায়ালার দয়ার বিশালতায় যেন আমরা উল্টোটা না বুঝি। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে মনকে বুঝায়, আল্লাহ্ পাক তো অনেক দয়ালু। গুনাহ করি, পরে তওবা করে নেব। ভাই! এটা কেমন অকৃতজ্ঞতা! যে মহান মালিকের দেয়া জান, মাল, তাঁর দুনিয়ায় বসে সে মালিকের সাথে বেঈমানী করেছি। দুনিয়ার কুকুর তাঁর মুনিবের রুটি খেয়ে তার সামনে মাথা ঝুকিয়ে দেয়। আর আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, মাল খাদ্য খেয়ে তার নাফরমানিতে কোমর বেধে নেমে পড়ি। এও কি কোন চরিত্র হল?

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালবাসার নমুনা

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.) বলেন, আমি একদিন মসজিদে হারামের একটি স্তম্ভের নিচে একজন যুবককে দেখলাম। সে যুবকটি রোগাক্রান্ত ও অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। তার বেদনায় ভারাক্রান্ত অন্তর থেকে শুধু আহ্ শব্দটি বের হচ্ছে। যুন্নুন মিসরী যুবকটিকে সালাম দেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। যুবকটি বলে, আমি একজন মুসাফির। আল্লাহ পাকের প্রেম মুহাব্বতে দেওয়ানা হয়ে এখানে পড়ে আছি। যুবকটির কথা শুনে আমি ভাবলাম, আল্লাহ্ পাকের আশেক হলে এমনই হওয়া উচিত। আমি যুবকটিকে বললাম, আমিও তোমার মতই একজন। এ কথা শুনে সে কাঁদতে থাকে এবং আমিও তার সাথে কাঁদতে লাগলাম। এরপর যুবকটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, আমিও তোমার মত এক আল্লাহ্ তায়ালার আশেক। একথা শুনে যুবকটি আরও অধিক পরিমাণে কাঁদতে থাকে। এক সময় হঠাৎ সজোরে চিৎকার দিয়ে সে মারা যায়। এ অবস্থা দেখে আমি কিছু সময়ের জন্য থ হয়ে রইলাম। যখন আমার অবস্থা স্বাভাবিক হলো, আমি আল্লাহ্ তায়ালার আশেক যুবকটির দেহ একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। বাজারে গেলাম কাফন আনতে। কাফন নিয়ে এসে দেখি তার লাশটি নেই। লাশটি কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায়। তখন আমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ (সে কোথায় গেলো?) এমন সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো।

হে যুন্নুন! সে এমন এক পথিক, যাকে শয়তান ধোঁকা দিতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। তোমার সম্পদের অল্প কিছু মাত্র তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে, তাও হয়নি। রিদওয়ান ফেরেশতা তাকে জান্নাতের আহ্বান জানিয়েছে, তাও সে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন সে কোথায় আছে?

উত্তর আসলো, فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ,

যোগ্য আসন, সর্বাধিপতি মহান আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে। (সূরা কামার-৫৫)

লোকটিকে আল্লাহ্ তায়ালা উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, এর কারণ হচ্ছে, সে আল্লাহ্ পাকের আশেক ছিল। অত্যধিক ইবাদতে মগ্ন থাকত এবং তওবা ও অনুতাপের বেলায় দ্রুত অগ্রগামী ছিলো।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

এ যুবকটির ঘটনাটি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভালবাসার সামান্য কিছু নমুনা মাত্র। দশভাগের একভাগ। যদি আল্লাহ্ পাক কোন বান্দার প্রতি তাঁর মুহাব্বতের অর্ধ অনুপরিমাণ দান করেন, তাহলে সে বান্দার দুনিয়ার কোন খবর থাকবে না।

আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বতের আরেকটি ঘটনা

একবার হযরত ঈসা (আ.) একজন যুবকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যুবকটি বাগানে পানি সেচের কাজ করছিল। হযরত ঈসা (আ.) কে দেখে যুবকটি বলে, হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাকে তার মুহাব্বতের অনু পরিমাণ অংশ দান করেন। হযরত ঈসা (আ.) বলেন, হে যুবক! অনুপরিমাণ মুহাব্বত সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নেই। যুবক বলে, তাহলে অর্ধ অনু পরিমাণ মুহাব্বতের দোয়া করুন। এরপর হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করেন, হে মহান রাব্বুল আলামীন! এ যুবককে আপনার মুহাব্বতের অর্ধানু পরিমাণ দান করুন। দোয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) চলে যান।

কিছুদিন পর হযরত ঈসা (আ.) সে যুবকের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, লোকেরা বলে, বহুদিন যাবত যুবকটি পাগল অবস্থায় দিন যাপন করছে। বর্তমানে সে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এ খবর শুনে হযরত ঈসা (আ.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! সে যুবকের সাথে আমাকে সাক্ষাত করিয়ে দিন। দোয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) দেখতে পেলেন, সে যুবকটি অসংখ্য পাহাড়ের মাঝখানে একটি উঁচু শিখরে আসমানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হযরত ঈসা (আ.) তাকে সালাম দেন, সে কোন উত্তর দিল না। পুনরায় হযরত ঈসা (আ.) নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, হে যুবক! আমি ঈসা। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি ওহি আসল, হে ঈসা! যার অন্তরে আমার ভালবাসার অর্ধানু পরিমাণও প্রবেশ করেছে, সে কখনও মানুষের আওয়াজ শুনতে পারেনা। শুনে রাখো, আমার মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম, তুমি যদি করাত দিয়ে তাকে চৌচির করে ফেল, তবুও সে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারবে না।

তাইতো শিবলী (রহ.) বলেছেন–

ذِكْرُ الْمَحَبَّةِ يَا مَوْلَايَ اَسْكَرَنِيْ ❁ وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانِ

হে মাওলা! ইশক ও মুহাব্বতের স্মরণই আমাকে দেওয়ানা (বেহুশ) করেছে। আর প্রকৃত প্রেমিক স্বভাবতই দেওয়ানা হয়ে থাকে।

ইমাম গাজ্জালী রহ. লিখেছে, হে সাধক! নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য তুমি কি কখনও হারাম কাজ বর্জন করেছো? নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করেছো? একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাজি ও খুশির জন্য কোন কঠিন সাধনায় কি ব্রতী হয়েছো? পানাহার ত্যাগ করেছো? এগুলোর কোনটাই যদি না করে থাকো, তাহলে তোমার সকল দাবীই অসার, অর্থহীন। মুখে মুখে আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বতের দাবী কর, অথচ কার্যত তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত রয়েছো।

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّاَطَعْتَهُ ❁ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

বস্তুতই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তাহলে তুমি আল্লাহ্ তায়ালার অনুগত হয়ে চলতে। কেননা সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।

মোটকথা ভালবাসার দৃষ্টান্তই মাহবুব বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া। তাঁর অনুকরণ অনুস্মরণ করা এবং তাঁর অবাধ্যতা ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

প্রকৃত জীবনতো তাই

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! প্রতিদিন কত মানুষ এ দুনিয়ার সফর শেষ করে কবরের যাত্রী হচ্ছে। আমরা কি ভাবি, এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে? এ লোকটি, যে আমাদের সাথে সত্তর আশি বছর ছিল, আজ তার নিজের তৈরি সুন্দর বাড়ি

থেকে তাকে বের করে নয়া হচ্ছে? আরাম আয়েশ করে থাকার জন্য যে যুবক দামি তোষক, জাজিম, সোফা সেট সহ যাবতীয় বিলাসদ্রব্য দিয়ে নিজের ঘরটি সাজিয়েছে, অথচ আজ সবাই তাকে রেখে এসেছে কবরে। মাত্র তিন টুকরা কাপড়, আর সাড়ে তিন হাত ঘর।

হায়রে জীবন!

কয়দিনের এ জীবন?

কতক্ষণের এ জীবন?

কয় সেকেন্ডের ভরসা এ জীবনের?

প্রিয় ভাই ও বোন! আমার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করুন। পরকালের পূজি সংগ্রহ করুন। মহান মালিকের নাফরমানী ছাড়ুন। দুনিয়ার সম্পদের পিছে পড়ে আখিরাত বরবাদ করবেন না। শেষ বিচারের দিনে এ সম্পদ আপনার কি কাজে আসবে? দুনিয়াতে আপনি সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পরকালে যদি নেকী না থাকে, তাহলে আপনার কোন মূল্য নেই। পরকালে সে ব্যক্তি ধনবান থাকবে, যার কাছে ঈমান ও আমলের পুঁজি থাকবে।

তাইতো বলি, ভাই, বোন, পরকালের পুজি কামাই করুন। আমার আপনার জন্য একটি দিন নির্ধারিত হয়ে আছে। সে সময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। তা হতে পারে, একটি সন্ধ্যা বা সকাল। দুপুর বা রাত।

সপ্তাহ, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড। মালাকুল মওত আসবেন, যে কোন সময়। চিরদিনের জন্য আমার জীবন ঘড়ি থেমে যাবে। কত মায়া মোহাব্বতের এ দুনিয়া আমাকে ছুড়ে ফেলবে। আমার প্রাণহীন দেহটা তখন পৃথিবীর জন্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। আত্মীয় স্বজন আমাকে কবরে রেখে এসে অবসর হয়ে যাবে। আমি একা পড়ে থাকবো অন্ধকার কবরে।

আমাকে আর কারও প্রয়োজন নেই। আমিতো আর কাউকে কিছু দিতে পারব না। কারও উপকার করতে পারব না। তাহলে তাদের কি প্রয়োজন আমাকে? অথচ এ জগত সংসারে কত পরিশ্রম করে সম্পদ গড়েছিলাম। লাখ লাখ টাকা ব্যাংকে। বাড়ি গাড়ি সব ছেড়ে একাকি কবরে পোকা মাকড়ের আহার হচ্ছি।

আর দুনিয়ার সব সম্পদ যদি কবরে দিয়েও দেয়া হয় তাহলেই বা কি লাভ? আমার আসল সম্পদের ভাণ্ডারইতো শূন্য।

হায় ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া! তোমার ভালবাসায় আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে গিয়েছিলাম। এ ভুলের তো কোন কাফফারা নেই। আমার কি উপায় হবে? নিঃস্ব অসহায়, রিক্ত হতে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমরা দাঁড়াবো?

হাশরের মাঠে যার বাম হাতে আমলনামা আসবে। তখন তার হতাশার শেষ থাকবে না। আফসোস করতে করতে বলবে,

مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ

আমার ধন সম্পদ আমার কোন কাজে এলো না। (সূরা আল হাক্কাহ-২৮)

এরপর ফেরেশতাগণ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। গলায় আগুনের শিকল পড়িয়ে।

আজ দুনিয়ার মানুষ জাহান্নামের আগুনে বসেও হাসছে। খবর নেই তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে তেজ দেয়া হচ্ছে। আর মানুষ হাসছে, খেলছে আমোদফুর্তি করছে।

ও প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হোন। মৃত আত্মাকে জীবিত করুন। অন্ধকার আত্মাকে আল্লাহ্ তায়ালার গোলামী দ্বারা আলোকিত করুন। তাবলীগী জামাত মানুষের অন্তরে এ কথাটাই পৌঁছে দিতে চাইছে। যে এ মৃত আত্মাকে জীবিত করে তোল। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণ অনুকরণ কর, যে পথে চললে, আল্লাহ্ তায়ালার দিদার পাওয়া যায়। যে পথে চললে দুনিয়া ও গড়া যায়। আখিরাতও গড়া যায়। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা! আল্লাহ্ তায়ালাকে চেনো

মৃত্যুর পর যে জীবনের সূচনা হবে, তাই তো প্রকৃত জীবন। মানুষ জানেনা তার জীবনের সমস্যা সমাধান কি? মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সমাধানতো আল্লাহ্ কোরআনে বলে দিয়েছেন। মানুষ প্রতিনিয়ত তা শুনছে। কিন্তু মানুষ তার কোন গুরুত্ব দেয় না। আহ! কত মন্দ কপাল আমাদের!

আমরা এমন মালিককে নারাজ করছি। যার দয়ার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান। আমি তোমাকে স্মরণ রাখছি। আর তুমি আমাকে ভুলে যাও! আমি তোমার পাপের উপর পর্দা ফেলে রাখি। আর তুমি আমার অবাধ্যতার মাত্রা বাড়িয়ে দাও!

এ মজমায় উপস্থিত হাজার হাজার মুসলমান। তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাও। আল্লাহ্তো আমাদের আপনই, শুধু আমাদের ভুলের জন্য সম্পর্কটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে। ভুল শুধরে যদি আবার আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কাঁদি। তওবা করে মাফ চাই। তাহলেই তো সম্পর্ক জোড়া লেগে যাবে। আসুন ভাইও বোনেরা! আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কটা জুড়া লাগাই।

এতে কোন কষ্ট ক্লেশ নেই। টাকা লাগে না। শুধু অনুতপ্ত হৃদয়ের দু'ফোঁটা অশ্রু।

তাবলীগ জামাত মূলত বিচ্ছিন্ন হওয়া আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে জুড়ে দেয়ার কাজটা করে। আসুন, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে জুড়ে যাই। আমাদের আর কোন আবদার নেই। কারণ, একদিন আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। এ জগত আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তায়ালাকে খুশি করা অনেক সহজ। এর জন্য আমাদের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করতে হবে না। শুধু জীবন যাপনের পদ্ধতিটা পরিবর্তন করতে হবে। আমাদেরকে এ শহর ছাড়তে হবে না। গ্রাম ছাড়তে হবে না। শুধু শহর-নগর, গ্রাম ও বাড়ি ঘরের মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরিকা প্রবেশ করাতে হবে। নিজের সব ইচ্ছা অনিচ্ছা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরিকা অনুযায়ী করতে হবে। তাহলেই সমাজ রাষ্ট্র থেকে সকল অশান্তি দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের যে পথের কথা বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, সেটিই হলো জান্নাতের পথ। দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষ যদি এ পথে এসে যায়, তাহলে দুনিয়া জান্নাতের মত হয়ে যাবে।

আসুন তওবা করি

আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাগণ! আসুন আমরা আল্লাহ্ তায়ালার রাজি খুশিকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নেই। আল্লাহ্ তায়ালাকে খুশি করা খুব সহজ। দুনিয়াতে মাতা পিতার সঙ্গে সন্তানের ঝগড়া হলে তাদের সন্তুষ্ট করতে কতই না পরিশ্রম করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালা অবাধ্য বান্দার তওবার অপেক্ষায় থাকেন। বান্দা যতই আল্লাহ্ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করুক, যদি বান্দা খাঁটি অন্তরে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেন।

এগুলো কি বড় বেদনার বিষয় নয়? যে আমরা এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেলে পেরেশান হই না। ভয়ে অনুশোচনায় আমাদের অন্তর কেঁপে উঠার কথা ছিল। পেরেশান হয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের কি হলো? যে মাসের পর মাস চলে যায় নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়াই না? আল্লাহ্ তায়ালার বিধানগুলোকে গুরুত্ব দেই না? এমন ক্ষমতাধর মালিককে আমরা রুষ্ট করছি, যার সামনে দাঁড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। যার সামনে আমাদের দাঁড়াতেই হবে। কি জবাব দেব এ অকৃতজ্ঞতার?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তুমি একবার তওবা করো, আমি দশবার ক্ষমা করব। তুমি তওবা করো। এরপর দেখ আমি কিভাবে ক্ষমা করি। আল্লাহ্ সকল মর্যাদাবানের বড় মর্যাদাবান। সব মহানের বড় মহান। সে আল্লাহ্ তায়ালা অপেক্ষা করছেন, তাঁর অবাধ্য গোলাম কখন তওবা করবে। ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ্ পাক কখনও এ কথা বলেন না, সারাজীবন পাপ করেছো। আমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছো সারা জীবন। এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছো, কবরে যাবার সময় হয়েছে, তাই আমার কাছে মাফ চাইতে এসেছো। না-আল্লাহ্ এমনটা বলেন না। বরং জীবনের শেষ মুহূর্তে তওবা করলেও আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করেন। শর্ত হলো, তওবা হতে হবে আন্তরিকতার সাথে। বলতে হবে, হে আল্লাহ্! আমি পাপি, সারাজীবন গুনাহ্ করেছি। তোমার অবাধ্য ছিলাম। তুমি তো দয়ালু, রহমানুর রাহীম। আমাকে ক্ষমা করো।

বান্দা যখন তওবা করে, আসমানে তখন আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। আকাশকে আলোক সজ্জা করা হয়। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করে, এ কিসের আলোক সজ্জা? উত্তরে এক ফেরেশতা সব কটি আকাশে ঘোষণা করে, আজ আল্লাহ পাকের এক অবাধ্য বান্দা তওবা করেছে। সে আনন্দে আকাশ আজ সজ্জিত করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! উৎসব তো করার কথা ছিল আমাদের। আমরা তওবার সুযোগ পেয়েছি। মহান মালিকের সাথে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক আবার জোড়া লেগেছে। দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ কেটে গেছে। অথচ আমাদের তওবায় আল্লাহ্ তায়ালার কোন পরোয়া নেই। আমরা তওবা করলেও আল্লাহ্ বড়– না করলেও বড়। আমরা নামায পড়লেও আল্লাহ্ মহান, না পড়লেও মহান। আমাদের আনুগত্য তার মর্যাদার কোন হেরফের হয় না। আমাদের অবাধ্যতায় তার মর্যাদা নিচু হয় না। কিন্তু তার পরও তিনি আকাশকে সজ্জিত করেন। যে দেখো আমার বান্দা আমার কাছে ফিরে এসেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ঘরে একজন মেহমান এলো। ইব্রাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঈমান এনেছো? মেহমান বলে, না। ইবরাহীম (আ.) বলেন, আমি কাফেরকে কিছু খাওয়াব না। লোকটি উঠে চলে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে পাঠিয়ে দেন। বলেন, ইব্রাহীম! সে লোকটি নাফরমান ছিল, তো আমার ছিল। সত্তর বছর পর্যন্ত আমি তাকে খাবার দিয়ে আসছি। এক বেলার জন্যও আমি তার খাবার বন্ধ করিনি। অথচ এক বেলা খাবারের জন্য সে তোমার কাছে গেল। আর তুমি তাকে না খাইয়ে বিদায় দিলে। যাও তাকে ফিরিয়ে আনো, খাবার দাও।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার!

যে আল্লাহ্ কাফেরদের প্রতি এত দয়াবান। তিনি তাঁর প্রিয় হাবিবের উম্মতের প্রতি মেহেরবান হবেন না কেন?

তাই বলছি, আসুন আমরা সত্য দিলে তওবা করি। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার আগে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার সামনে মাথাটা ঝুকিয়ে দেই। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভাই, সময় কখন এসে যায়, কেউ জানেনা। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

তওবাকারীর বিস্ময়কর ঘটনা

বনী ইসরাইলের এক পাপি যুবক ছিল। তার অন্যায় অপরাধ ও জুলুম জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ তাকে শহর থেকে বের করে দিয়েছিল। শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর যুবকটি নিরাশ্রয় অসহায় হয়ে জনমানবহীন একস্থানে গিয়ে পড়ে থাকে। যুবকটি নিরুপায়, অসহায়। তাকে দেখার মত কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহ্ তার ভরসা।

কয়েকদিনের অনাহারে যুবকটি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গেল। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যুবকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার এক নাফরমান বান্দা। আমাকে শাস্তি দিলে তোমার রাজত্ব বৃদ্ধি পাবে না। আর আমাকে ক্ষমা করে দিলে তোমার রাজত্বে কোন কমতি হবে না। হে আল্লাহ্! তুমি তো দেখছো, আমি চরম অসহায় অবস্থায় আছি। এখন দুনিয়াতে সবাই আমার পর। আপনজনরাও আমাকে সাহায্য করবে না। তারা সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। এখন তুমি ছাড়া আমার সহায় আর কে আছে? তুমি আমার একমাত্র সহায়।

হে আল্লাহ্! আমি গুনাহগার, তোমার অবাধ্য। তোমার অকৃতজ্ঞ এক বান্দা। তুমিতো ক্ষমাশীল। তুমি দয়াময়। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এতটুকু বলার পর যুবকটি মারা গেল। আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য এ বান্দার তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি ওহী এলো, হে মুসা! আমার এক বান্দা, যে তওবা করে আমার মন জয় করেছে। সে এক জনমানবহীন প্রান্তরে মারা গেছে। তুমি গিয়ে তাকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়ে দাফন করো। আর শহরের যত অপরাধী আছে, পাপি আছে, আমার অবাধ্য বান্দা আছে, তাদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, যারা তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দেব।

হযরত মুসা (আ.) শহরে এ ঘোষণা করে দেন। ঘোষণা শোনামাত্র মানুষ সে বিজন অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা দিল। যেন তারা সকলেই পাপি, সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য। তারা গিয়ে দেখল, এতো সে পাপিষ্ঠ যাকে তারা শহর থেকে বের করে দিয়েছিল। যার অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। এতো সে যুবক, যে ছিল মদ্যপ, জুয়াড়ী, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনকারী। সবাই বিস্মিত হলো। বিস্ময় তাদের কাটছেই না। তারা হযরত মুসা (আ.)কে বলে, এটা আপনি কি বলছেন? সেতো মন্দ চরিত্রের লোক ছিল, এমন কোন অপরাধ নেই যা সে করেনি। অতিষ্ঠ মানুষের তাড়া খেয়ে এখানে এসে সে অনাহারে মারা গেছে।

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার কাছে বলেন, হে আল্লাহ্! তোমার এ বান্দারা বলছে সে নিকৃষ্ট ধরনের লোক ছিল। তোমার অবাধ্য ছিল। আর আপনি বলছেন, ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে, তারাও সত্য বলছে। যুবকটি মন্দ ছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় ছিল সম্পূর্ণ অসহায়, নিরাশ্রয়। পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে হারিয়ে সে আমার আশ্রয় চাইল। আমাকে ডেকেছে, এমন কাতর মনে আমাকে ডেকেছে, আল্লাহ্ বলেন, আমার সত্তার শপথ করে বলছি, সে যদি শুধু নিজের জন্য ক্ষমা না চেয়ে সকলের জন্য ক্ষমা চাইতো, তাহলে এর উছিলায় আমি সবাইকে মাফ করে দিতাম। আমি গাফুরুর রাহিম। আমি তার তওবা কবুল করেছি। তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার জানাযায় যত নাফরমান অংশগ্রহণ করবে, সবাইকে ক্ষমা করে দেব।

এ হলো তওবার গুণ, তওবাকারীর মর্যাদা। আল্লাহ্ আমাদের তওবা করার সুযোগ দিন।

শয়তানের পথ অনুসরণ করো না

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা। শয়তানী পথ অনুসরণ না করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের মাধ্যমে শয়তানের বিছানো ফাঁদকে অকার্যকর করে দেয়া। শয়তান মানুষের চির শত্রু। প্রতিকাজে ও প্রতিক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা করা। সর্বপ্রকার সতর্কতার সাথে, নিজের ঈমান আকীদায় শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা তোমার ইবাদত বন্দেগীতে কখনও যদি শয়তান অহংকার ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে তোমার ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবে। অনেক সময় শয়তান পাপ কাজকে সুন্দর ও নেক কাজের

সুরতে মানুষের সামনে পেশ করে। এমনভাবে তা পেশ করে, যে, মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। অনেক মানুষ অসাবধানতায় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে কাজকে নেক কাজ মনে করে পালন করতে থাকে। যেমন কবরে সিজদা করা। কবরে মান্নত করা, পীরকে সিজদা করা। অথচ এটা শিরক। ঈমান আমল ধ্বংস করে দেয়। এ কাজগুলো এখন মানুষ নেক কাজ মনে করে করছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযী) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির উপর একটি রেখা টেনে বলেন, এটা হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার পথ। এরপর ডানে বামে আরও কতগুলো রেখা আঁকলেন এবং বলেন, এগুলো ও পথ, কিন্তু প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে ধ্বংস ও বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করছে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا –فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ

নিশ্চিত, এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা আনআম-১৫৩)

ইবলিসের প্রশ্ন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জবাব

একদিন অভিশপ্ত ইবলিস ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে প্রশ্ন করেছিল, হে শাফেয়ী! আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করেছেন। এরপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে জান্নাত দেবেন, বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সবই দেখি তার ইচ্ছা। এটা কি কোন ইনসাফ বা নীতি হলো? (নাউজু বিল্লাহ)

শয়তানের প্রশ্ন শুনে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। এরপর বলেন, সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর অভিপ্রায় অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে অন্য কথা। আর যদি আল্লাহ্ তার নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে স্মরণ রাখ, যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহিতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত পবিত্র।

শয়তান ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জবাব শুনে বিফল হয়ে পালাতে থাকে। আর বলতে থাকে, হে শাফেয়ী! আমি এ একটি মাত্র প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবেদ ও আল্লাহ্ভীরু লোককে পথভ্রষ্ট করেছি।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! তোমার অন্তর হলো দুর্গস্বরূপ। আর শয়তান হলো তোমার দুশমন। শয়তান সর্বদা এ চেষ্টাতেই থাকে যে, কি করে সে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার দখল নিতে পারে। তাইতো অন্তরকে হেফাযত করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে অন্তরের দরজাসমূহ হিফাজত করা। অন্তরের দরজায় পাহারা বসানো। আর এ পাহারা হলো, আল্লাহ্ তায়ালার ভীতি, ইলম ও আমল। দ্বীনী ইলম, বান্দাকে সঠিক পথের পরিচালিত করতে সাহায্য করে। আর আমল অন্তরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে। অন্তর পবিত্র হয়। আর যার ইলমও নেই আমলও নেই। তার অন্তরতো কালো অন্ধকার হয়ে আছে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে নিজেও শয়তান হয়ে গেছে। নিজেকে ঈমানদার দাবী করে, অথচ কাফের মুশরিকদের সব বিষয়গুলো অনুস্মরণ অনুকরণ করে চলে।

তো ভাই!

আমাদের দ্বীন শিখতে হবে। ইলম ও আমলের পথে আসতে হবে। তা না হলে আমাদের অন্তরের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। শয়তানের ধোঁকা প্রতারণায় পড়ে বরবাদ হয়ে যাব। আজতো আমাদের অন্তর অন্ধকারে ভরে আছে। শয়তান সেখানে বাসা বেঁধেছে। আমার কামনা শুধু দুনিয়ার ধন সম্পদ কামাই করা। মানুষের সাথে প্রতারণা করতে করতে নিজের বিবেকের সাথে ও প্রতারণা করে চলছি। নিজের বিবেককে ভাল পথে খরচ করি না। আজ আমরা মৃত আত্মা নিয়ে জীবন পার করছি। আমাদের অন্তর আজ আমাদের দেহের সমাধী।

তাবলীগ নবীওয়ালা পথ– জান্নাতের পথ দেখায়

তাবলীগী মেহনত, এমন একটি কর্মসূচি যা মৃত আত্মাকে জীবিত করে। তাবলীগ জামাত আল্লাহ্ তায়ালার পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়। মানুষ তরবিয়ত দ্বারা শিক্ষা লাভ করে। দ্বীনও তরবিয়তের মাধ্যমেই আসে। আমাদের দ্বীন শিখতে হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আমাদের জীবনে বাস্ত বায়ন করতে হবে।

আমাদের ভেতর ঈমান আছে। কিন্তু ঈমানের কোন উন্নতি নেই। আমরা তাবলীগ জামাত দুনিয়াতে ঘুরে ঘুরে মানুষের ভেতর ঈমানের তেজ পয়দা করছি। ঈমানকে তাজা করতে হবে। এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যেন, হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একেকটি সুন্নাতকেও আমরা ছেড়ে না দেই। আমাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগ্রহ অপরিসীম। তিনি ক্ষুধায় কষ্ট করেছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। এরপরও দ্বীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এতবড় দয়ালু নবী পেয়েও আমরা তার জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করি। আজ কত অবহেলায় মানুষ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে অবহেলা করছে। কটাক্ষ করছে। আজকের তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করছে। আজ মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছে। কথাবার্তায়, চাল-চলনে, অনুকরণ অনুসরণে, ইহুদী খৃষ্টানদের মত। আজকের তরুণ-তরুণীদের অবস্থা বড়ই করুন। তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। নাচ-গান তাদের প্রিয়। আজকে ব্যবসায়ীরা প্রিয় নবীর দ্বীনকে বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত নয়। কারণ এতে নাকি তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয়!

রাজনীতিবিদরা দ্বীনের পথে আসতে রাজি নয়। এতে নাকি রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে। আজ সবাই কেমন যেন দ্বীন ধর্মকে ব্যক্তিজীবন থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এখন সকলেই সম্পদের লোভে উন্মাদ। দুনিয়ার কামাই করতে গিয়ে ভুলে গেছে দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় সম্পদকে। যা আমাকে শেষ বিচারের দিনে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমাকে লজ্জা থেকে বাচাবে। যে নবীর আদর্শকে অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিলাম, সে প্রিয় নবীই হাশরের ময়দানের সংকটময় মুহূর্তে আমাদের ভুলবেন না। তিনি সেখানেও কাঁদবেন, উম্মতি উম্মতি করে।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমরা কালেমা পড়ে মনে করি মুসলমান হয়ে গেছি। অথচ কালেমার দাবী শুধু এতটুকুই নয় যে, পাথরের মূর্তিকে পুজা করতে পারব না। তাকে সিজদা করতে পারব না। বরং যে সকল বস্তু আমাদের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্র বিন্দু। যা কিছু আমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়। আমাকে ভুলিয়ে রাখে। তাকে ভাঙ্গতে হবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যেমন সকল মূর্তি ভেঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ করছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম-৭৯)

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মতো চোখে দেখা সকল মূর্তিকে ভাঙ্গতে হবে। ভাঙ্গতে হবে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত সকল মূর্তিকে। যা কেড়ে নিচ্ছে আমাদের চিন্তা, চেতনা। যা গাফেল করছে আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার পথে চলতে।

আসুন আমরা মহান আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনি। বুঝতে শিখি, আকাশ ও জমিনের সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ তায়ালার হাতেই আমার জীবনের সকল কল্যাণ, অকল্যাণ। সুস্থতা, অসুস্থতা, মান-সম্মান। সুতরাং তাকে না মেনে আমাদের কোন উপায় নেই।

আল্লাহকে আপন করে নিন

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

পবিত্র কোরআন আমাদের পথ প্রদর্শক। দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা দিয়ে দিয়েছেন। কোরআন আমাদের সংবিধান। কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে দেহ মনকে জুড়ো। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক না গড়লে দুনিয়া ও আখিরাত গড়বে না। আল্লাহ্ বিহীন জীবনে না সুখ আছে, না সফলতা আছে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কহীন একজন মানুষ যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিকও হয়ে যায়, দুনিয়ার সমস্ত রূপ সৌন্দর্যও যদি সে লাভ করে। সমস্ত পৃথিবীর ক্ষমতার তাজ যদি তার মাথায় সুশোভিত হয়, কিন্তু যদি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তার কোন সম্পর্ক না থাকে। তাহলে এসব সম্পদ এসব সৌন্দর্য, এসব ক্ষমতা তার ভেতরের অন্ধকারকে দূর করতে পারবে না। এমন কোন বস্তু নেই, যা তার অন্তরের পেরেশানী, হতাশাকে দূর করতে পারে।

অন্তরের আঁধার দূর করতে আল্লাহ্ তায়ালার পথে আসতে হবে।

সমস্ত হতাশা পেরেশানীর নিরাময় একমাত্র আল্লাহ্।

পৃথিবীর সব কিছুর নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ্।

আমার আপনার অন্তরে শান্তি ও স্বস্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ্।

আল্লাহ্ তায়ালার কসম, আল্লাহ্ ব্যতীত আমার কোন স্বজন নেই। তিনি যদি আমার প্রতি রাজি ও খুশি না হন, তাহলে আমরা ব্যর্থ, কিছুই পেলাম না। সব হারালাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি রাজি ও খুশি হয়ে গেলে তো আমি সফল। আমার সব কিছু পাওয়া হলো।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ

হে আদম সন্তান! তুমি আমার দাসত্বের জন্য অবসর হও, আমি তোমার হৃদয়কে অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা ভরে দেব। আর অভাব অনটন দূর করে দেব। আর যদি তা না করো, আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দ্বারা ভরে দেবো।

তখন তোমার কাজের কোন শেষ থাকবে না। তোমার জীবনে একের পর এক বিপদ আসতে থাকবে। তোমার ব্যস্ততা ও ঝামেলার কোন কিনারা থাকবে না। তোমার জীবন অশান্তিতে ভরে থাকবে।

আজকাল আমরা বলি, আমার সন্তান বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকুরী করে। অনেক অর্থ কামাই করে। কিন্তু ভাই! আমাদের মানসিকতা এমন কেন? সন্তান অনেক বড় চাকুরী করে, বড় ব্যবসায়ী। এতে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। কিন্তু পিতা একবারও ভাবে না, এ সম্পদের সাথে সাথে যদি সন্তান আখিরাতের সম্পদ ও কামাই করতো। সুদ ঘুষের পিছে না পড়ে সন্তান যদি বৈধ টাকায় জীবন যাপন করতো। না, ভাবে না। পিতা ভাবেনা দুনিয়ার ইলমের সাথে যদি দ্বীনি ইলম ও শিক্ষা দিত, তাহলে সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই গড়ত। নেক সন্তান পিতামাতার জন্য পরকালীন সম্পদ।

কিন্তু আজ পিতা মাতা অর্থের জন্য ব্যাকুল। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে অর্থ সম্পদের স্বপ্ন দেখায়। দ্বীনদারীকে অবহেলা করে। যার করণে তার হৃদয়টা ঈমান ও আমল থেকে খালি থাকে। পরকালে এ সন্তান মাতাপিতার জন্য কোন কাজে আসবে না। আরও বিপদের কারণ হবে। কারণ পিতা মাতা সন্তানকে দ্বীন শিখায় নি। টাকার কুমির বানিয়েছে। সন্তান টাকার নেশায় পড়ে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শকে ভুলেছে।

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিকে তোয়াক্কা করেনি। সংসার জীবনে সুখ না পেয়ে অন্য নারীর সাথে পাপ কাজ করেছে, নেশা করেছে। আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য হয়েছে। টাকায় সুখ দেয় না। সম্পদে সুখ দেয় না। সুখ দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ্। সব সমস্যার সমাধানের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ তায়ালা যদি কারও অন্তরে না থাকে, তাহলে সম্পদ তাকে সুখ দিতে পারবে না। সুখ-শান্তি আল্লাহ্ তায়ালার দান। আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া সুখ শান্তি আসবে না।

হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ্ বলেছেন,

اِنِّىْ اِذَا اُطِعْتُ رَضِيْتُ

বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে, আমি তখন খুশি হই।

وَاِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ

আর আমি যখন সন্তুষ্ট হই, তখন বরকত দান করি।

ভাই ও বোন!

আজ মানুষ বলছে, আমাদের অন্তরে হতাশা আর পেরেশানীতে ভরে গেছে, মনে শান্তি নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি যদি আমার দ্বীনের পথে উঠে আস তাহলে আমি তোমার সকল পেরেশানী দূর করে দেব। আমি তোমার বিপদ আপদ দূর করে দেব। তোমার অভাব-অনটন দূর করে দেব। তুমি আমার দিকে আস, তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না। দুনিয়া তোমার পায়ের কাছে দৌড়ে আসবে।

শোন ভাই, বোন আমার! আমাদের অন্তর বিরান হয়ে গেছে। অঢেল অর্থসম্পদ কামাই করেও অন্তরে হতাশা, পেরেশানী। অন্তরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। সংসারে সুখ নেই। স্ত্রী কথা শোনেনা। স্বামী স্ত্রীকে রেখে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। ছেলে মেয়েরা কথা শোনেনা। এ মানুষগুলো অন্তরের পেরেশানী ভুলতে কখনও মদের বারে বসে মদ গিলে। কখনও বা নাচ-গানের আসরে রাত কাটায়ঢ। হায়রে শান্তি! দুনিয়ার শান্তির জন্য কত ভুল জায়গায় যে ঘুরছে মানুষ!

কখনও বাড়ি গাড়ি, অর্থ সম্পদের পিছনে। কখনও সুন্দরী নারীর পিছে। কখনও ক্ষমতার পিছে। এরপরও শান্তি পায়নি, পাবে না। এ হতাশা এ পেরেশানীর কোন দাওয়াই দুনিয়াতে নেই। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা তায়ালার খাঁটি বান্দা হওয়া ছাড়া এ পেরেশানির কোন দাওয়াই নেই।

আল্লাহ্ পাক তো বলেছেন, বান্দা! আমাকে স্মরণ করো, আমার হয়ে যাও। তাহলে তোমাদের হৃদয় জগত আবাদ হয়ে যাবে।

আমার দিকে ফিরে এসো, অন্তরের সব পেরেশানী সব হতাশা সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। আমার আনুগত্য তোমার অন্তরকে আলোকিত করবে।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আল্লাহ্ তায়ালা রহমানুর রাহীম। আপনি যখন হে আল্লাহ্ বলে ডাক দেন, আল্লাহ্ তায়ালা জবাব দেন, হে বান্দা! আমি হাজির। আসুন, ভাই ও বোনেরা! আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ফিরে যাই। পাপের পথ থেকে ফিরে আসি। তওবা করি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কবুল করুন– আমীন।

যুবকের তওবা

উতবা নামক এক যুবক যিনা করতো। মদপান করে মাতাল হয়ে পড়ে থাকত। তার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। সমাজে সে জঘণ্য ও কুখ্যাত ছিল। একদিন হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর মজলিসে সে যুবকটি উপস্থিত হয়। হযরত হাসান বসরী (রহ.) তখন এ আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে ওয়াজ করেছিলেন।

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

যারা মুমিন, তাদের কি আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর হৃদয়গ্রাহী ও মমস্পর্শী ওয়াজে তন্ময় হয়ে উপস্থিত শ্রোতাগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এমন সময় সে যুবক দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীকে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা! আমি একজন জঘন্য পাপি। আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য। আমার মত জঘন্য অবাধ্য বান্দাকে কি আল্লাহ্ মাফ করবেন? আমার তওবা কি আল্লাহ্ কবুল করবেন?

হযরত হাসান বসরী (রহ.) উত্তরে বলেন, অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা ও জঘন্য পাপাচারের পরও আল্লাহ্ পাক তোমার তওবা কবুল করবেন। হযরত হাসান বসরীর এ কথা শুনে সে যুবকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তার শরীর কাঁপতে থাকে। চিৎকার করতে করতে যুবকটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন যুবকটির জ্ঞান ফিরে এলো, হযরত হাসান বসরী তার কাছে গিয়ে কয়েকটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করেন।

ওহে নাফরমান যুবক!

যানো আরশের মালিকের (আল্লাহ্ তায়ালার) অবাধ্যতার শাস্তি কি? সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত। তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে থাকবে ক্রুদ্ধ গর্জন। তোমার পাপের শাস্তিস্বরূপ তোমাকে টেনে হেচড়িয়ে সে ভয়াবহ আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। হে যুবক! তুমি যদি সে আগুনের তেজ সহ্য করার ক্ষমতা রাখো, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করতে থাক। নয়তো বা এখনই বিরত হও। বস্তুত তুমিতো অন্যায় আর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছো। এখনও সময় আছে, নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো।

হযরত হাসান বসরীর একথাগুলো শ্রবণ করে যুবকটি চিৎকার দিয়ে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে যায়। এবার জ্ঞান ফিরার পর সে বলতে থাকে, হে শায়খ! আমার

মত বদনসীব ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত বান্দার তওবাও কি আল্লাহ্ কবুল করবেন? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ্ কবুল করবেন। এরপর যুবকটি আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে এ দোয়া তিনটি করল।

(১) হে আল্লাহ্! আপনি যদি দয়া করে আমার তওবা কবুল করেন এবং আমার পাপগুলো ক্ষমা করে দেন, তাহলে আমাকে তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, প্রচুর স্মরণশক্তি, প্রখর ধীশক্তি দান করুন। যাতে উলামায়ে কিরামদের কাছ থেকে শোনা সব বিষয়ের ইলম ও কুরআনী জ্ঞান আমি সংরক্ষণ করতে পারি।

(২) আমাকে মনমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর দান করুন। যাতে যে কোন পাষাণ হৃদয়ের মানুষ ও আমার তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয়। আপনার মহত্বও বড়ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

(৩) হে আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন। আর আপনার কুদরতী ভাণ্ডার থেকে আমাকে সাহায্য করুন।

মহান রাব্বুল আলামীন যুবকটির তিনটি দোয়াই কবুল করেন। ফলে তার মেধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল। তার কোরআন তিলাওয়াত শুনে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষও তওবা করতো। প্রতিদিন তার গৃহে দু'টি রুটি এবং এক পেয়ালা তরকারী পৌঁছে যেত। কিন্তু এ খাদ্য কোথা থেকে কিভাবে আসতো, কেইবা প্রতিদিন পৌঁছে দিত, সে সম্পর্কে যুবক কিছুই বলতে পারত না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরশের নিচে লেখা আছে,

اَنَا مُطِيْعٌ مِنْ اَطَاعَنِىْ وَاُحِبُّ مَنْ اَحَبَّنِىْ وَمُجِيْبٌ مِنْ دَعَانِىْ وَغَافِرٌ لِّمَنْ اَسْتَغْفِرِىْ

আমার অনুগত বান্দার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি। যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি। যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি। যে আমার কাছে মাফ চায়, তাকে আমি মাফ করি।

কালেমার দাবী

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ কালেমার দাবী কি আমরা পূরণ করতে পারছি? কালেমাওয়ালা হয়ে আমরা আজ কি করছি? আমরা আজ আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুস্মরণ করছি?

আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। দুনিয়ার মায়া মোহাব্বতে পড়ে কালেমার দাবীকে ভুলে গেছি। পথ হারিয়েছি। আলো ছেড়ে অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে জীবন পার করছি। এক কবি বলেছেন,

جو ہی گویم مسلمانم بلرزم - کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ

এখানে কবি বলেছেন, যখনই আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করি, বলি আমি মুসলমান। তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্ব কেঁপে উঠে। অথচ আমরাতো দাবী করছি আমরা মুসলমান। পাঠ করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কই আমার শরীরের একটি উকুনও তো কেঁপে উঠে না। কেন? আসলে আমরা কালেমার হাকিকত বুঝিনি। নিজেকে ঈমানদার দাবী করি। কিন্তু ঈমানের দাবীগুলো বাস্তবায়নে আমাদের আগ্রহ নেই।

অথচ, কালেমার দাবী হলো, আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথে নিজেকে পরিচালনা করা। এটাই মুসলমানের একমাত্র পথ। যে পথ আমাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। যে নববী আদর্শ আমাকে পবিত্র করবে।

আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের পথেই আমাদেরকে পৌঁছতে হবে জান্নাতের দিকে। আমাদের জীবনে এর বাইরে থেকে কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আমরা নারী হই আর পুরুষ হই, পথ একটাই। সে পথটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের দেহ মনকে সর্বক্ষণ সে পথে ব্যবহার করি। আমরা যেন সে পথ থেকে বিচ্যুত না হই। আমাদের চোখ, আমাদের কান, আমাদের অন্তর, আমাদের আচরণ যেন সে পথের বাইরে না যায়।

দুনিয়াতে আমাদের চলার পথে অন্য কোনদিকে তাকাবার অবকাশ নেই। আমরা দেখব একমাত্র খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। আমরা দেখব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকাকে। দেখব তার জীবনাদর্শকে। আমাদের লক্ষ হবে আল্লাহ্। তাই, আল্লাহ্ আমাদের কাছে কি চান? আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কি চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে চাওয়া আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন।

আমরা পৃথিবীতে সুখের নিবাস রচনা করে ভোগ বিলাসে থাকার জন্য তো আসিনি। আরাম আয়েশ আর আনন্দ ফুর্তির জীবনতো জান্নাতের জন্য। সে জান্নাতের পাথেয় কামাই করার বদলে আমরা দুনিয়া কামাই করছি। ভাই! সব

ধোঁকা, সব ভুল। ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য এত শ্রম দেয়ার কি দরকার? রিযিক দেয়ার মালিক তো আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহ্ তায়ালা যদি বরকত না দেন তাহলে আমার সম্পদ আমার কোন সুখ দিতে পারবে না। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও বরকত ছাড়া আমাদের সব কিছু ব্যর্থ হবে। তাই আল্লাহ্ তায়ালার পথে ফিরে আসতে হবে। নিজেকে আমরা ঠকাচ্ছি। নিজের সাথে প্রতারণা করছি। আমরা জান্নাতের সুখকে ভুলে আছি। জাহান্নামের দিকে ছুটছি। সে ভুল পথ থেকে ফিরে আসতে হবে ভাই, ও বোনেরা! নিজেদের ঈমান ও আমলকে সাজাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি দুনিয়ার পেছনে পড়ে যায়, দুনিয়ার শান শওকত যার লক্ষ্যে পরিণত হয়, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও অস্থির করে রাখেন। তার রিযিক ছড়িয়ে দেন। তার অন্তর ভরে দেন দুনিয়ার চিন্তায়। তাকে ক্লান্ত শ্রান্ত করে দেন। আর পরকাল তার থেকে দূরে সরে যায়। অথচ দুনিয়াতে তাকদীরের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

পক্ষান্তরে যে পরকালের কথা ভাবে, তার চিন্তা-ভাবনা, তার কান্না ব্যাকুলতা, অস্থিরতা সব পরকালকে কেন্দ্র করেই। সে দুনিয়ার সুখ শান্তির কথা ভুলে যায়। হৃদয় তার পরকাল চিন্তায় অস্থির থাকে। সে কবরের অন্ধকার ঘরের কথা ভেবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নিজের নাজাতের জন্য কাঁদে।

দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান

মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। যার জীবনাদর্শ আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ সংশোধনের দৃষ্টান্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবিগণ নারীদের জন্য হিদায়েতের উত্তম নমুনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দুজাহানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন হিদায়াতকারী দিয়েছেন। তিনি আমাদের আল্লাহ্ তায়ালাকে পাওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন, আল্লাহ্ তায়ালা একজন রাসূল দিয়েছেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা যেন তার দেখানো পথে চলি।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, তিনি আমার বন্ধু। আমার নবী। যিনি দু'জাহানের সরদার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানকে বলেছেন, আবু সুফিয়ান! আমাকে জানো, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান আনো। আমাকে শেষ নবী হিসেবে মানো। হাতেগড়া পাথরের মূর্তির পূজা ছাড়। দুনিয়াতেও তোমার জন্য ভাল হবে। পরকালও সুন্দর হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য শুধু পরকালীন কল্যাণ নিয়ে আসিনি। দুনিয়ার কল্যাণও নিয়ে এসেছি।

আদি ইবনে হাতেমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের দাওয়াত দেন, আদি ইবনে হাতেম কায়সার ও কিসরার বাদশাহদের জাকজমক দেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ দেখে মুগ্ধ হলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মাটিতে বসে, আদি ইবনে হাতেমকে বিছানায় বসালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আদি ইবনে হাতেম! মুসলমান হও। নাজাত পাবে। সফলতা পাবে। মর্যাদা লাভ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে আদি বিন হাতেম চিন্তায় পড়ে যান। এ আদি সে দানবীর হাতেম তাই এর ছেলে। সে নিজেও প্রসিদ্ধ এক গোত্রের সরদার।

আদি বিন হাতেমকে নিরব দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বলব, তুমি কেন নিরব হয়ে রয়েছো? তুমি এ জন্য নিরব যে দুশমন অনেক বেশি। আর বন্ধুর সংখ্যা কম।

এবং তুমি ভাবছ, মুসলমানরাতো সবাই দরিদ্র, গরীব এবং এমনও আছে যাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আছে অসংখ্য গোলাম। যারা প্রতিদিন তাদের মনিবদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। তাদের সাথে মিলে আমার কি উপকার হবে?

এবং তুমি আরও ভাবছ, মক্কার সরদাররা সবাই এদের বিরুদ্ধে। একথাগুলোই তোমার মাথায় ঘুরছে? আদি বিন হাতেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে বিস্মিত হলেন।

আসলেই তিনি একথাগুলোই ভাবছিলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আদি! শুনে রাখো আমার কথা। আল্লাহ্ তায়ালার কসম। আমার ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হবে। ইরান বিজয় হবে এবং তাদের সব সম্পদ মদীনায় আসবে।

আদি বিন হাতেম কিসরার শান শওকত দেখেছে। এ জন্য তার মনে একথার বাস্তবতা খুঁজে পাচ্ছিল না। আদি বিন হাতেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর কথার মধ্যে বলে, আপনি এটা কোন কিসরার কথা বলছেন? ইরানের কিসরা ছাড়া অন্য কোন কিসরা কি আছে? আদির কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, না, আমি কিসরায়ে ফারেস এর কথাই বলছি এবং আরও বলছি, যে সেই ইরান বিজয়ীদের দলে তুমিও থাকবে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আদি! তুমি হিরা শহর চেনো? (হিরা ইরাকের একটি শহর) আদি বলে, না দেখিনি। তবে নাম শুনেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন সময় আসবে, যখন হিরা শহর থেকে সুন্দরী একজন নারী স্বর্ণালঙ্কার পড়ে একা একা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত আসবে। এ নারীকে কেউ কিছু বলবে না। কেউ তার ইজ্জতের উপর হাত দেবেনা।

হযরত উমর (রাযী.) এর খিলাফতকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এ ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হলো। ইরান বিজয় হলো, ইরাক বিজয় হলো। মুসলিম সৈন্য যখন কসরে আবইয়ায্যে প্রবেশ করল। সেই দলে আদি বিন হাতেমও ছিলেন। আদি বিন হাতেম কেল্লার দেয়ালে উঠে ইরানের মহল দেখেন, মহলটি দেখে আদি বিন হাতেম বলে, আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন। আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সব কথা বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ সে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাদের ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলেছিলেন, মুসলমান হও কামিয়াব হবে। আমার মনে কত ভুল চিন্তাই না এসেছিল! যে এদের সাথে মিলে আমি কি পাব? এরাতো নিতান্তই গরবী, অসহায়, কমজোর। আজ তো আমি দেখছি, যে ইরানের সম্পদ মুসলমানদের দখলে।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের এমন একজন পথ প্রদর্শক দিয়েছেন, যিনি দুনিয়াও নিয়ে এসেছেন, আখিরাতও নিয়ে এসেছেন। জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন, দুনিয়ার সম্মানের সুসংবাদও দিয়েছেন। জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের মর্যাদা দিতে শেখ। তাহলেই আল্লাহ্ তায়ালা খুশি হবেন। সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বত থাকলে ফরযের প্রতি মুহাব্বত আসবে। যার ভেতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুস্মরণ নেই, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ফরয পালন থেকেও বঞ্চিত করেন। ফরযের জন্য সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সামর্থক বিষয়। যেমন টায়ারে হাওয়া না থাকলে গাড়ি অচল হয়ে যায় তেমন। আজতো আমাদের জীবনে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সকল সুন্নাতকে নির্মম ভাবে জবাই করছি। আমরা এ কোন চিন্তায় জীবন পার করছি? যেখানে একটি টায়ারের হাওয়া না থাকলে কোটি টাকার গাড়ি অচল হয়ে যায়, তাহলে ঈমানের এ গাড়ি কেমন করে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছবে– যদি তাতে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুস্মরণ না থাকে।

প্রিয় মুসলমান! উলামাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, সুন্নাত কি? সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদর করো, তাহলে ফরজ এর কদরও বুঝবে। আরে ভাই! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ তো আমাদের লাগবে। তার জীবনাদর্শ অনুসরণ করো। আমরা কি বিধর্মীদের অনুসারী হয়ে মরব? তাদের ফ্যাশন তাদের চালচলন নিয়ে আমরা কবরে যাব?'

আজ আমরা বিজাতীয়দের কালচার পালনে ব্যস্ত। অথচ দাবী করছি আমরা মুসলমান। আমরা মুহাম্মদী উম্মত! আরে মোহাম্মদী গোলাম হওয়া কি এতই সহজ যে, সারাজীবন ইহুদী নাসারাদের অনুসরণ করব। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি খুশি থাকবেন?

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! আল্লাহ্ তায়ালার চাওয়ার কথা একটু ভাবো। যখন আমরা আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীবের পথ ছেড়ে দুশমনের পথকে নিজেদের আপন বানিয়ে নেব। আমার আচরণ, আমার জীবন যাপন, আমার ঘর যখন ইহুদী নাসারাদের অনুকরণে চলতে থাকবে, তখন আমরা কোন মুখে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ মুহাম্মদী উম্মত বলে দাবী করবো? অথচ, আমাদের মাকছাদ তো হলো পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণ করে তার জীবনাদর্শকে আমাদের জীবনের প্রধান ও প্রথম করে নেয়া।

আজ আমরা ভুলে গেছি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনা থেকে এ বিষয়টা হারিয়ে গেছে। এ যুগে এ সময়ে মুসলমানরা বিষয়টি এমনভাবে ভুলে গেছে যে তারা কি করতে এসেছিল? তারা কি রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে দাঙ্গা ফাসাদ করতে এসেছিল?

না তারা সম্পদের পাহাড় গড়তে এসেছিল? বাড়ি গাড়ির মালিক হয়ে ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করতে কি এ মুসলমানরা এসেছিল?

এ উম্মত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত। এ উম্মতের কাজ ছিল, আপন নবীর দুঃখ কষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করা। তার আদর্শকে দুনিয়াব্যাপি ছড়িয়ে দেয়া। জীবন যাপনে, সমাজে, রাষ্ট্রে নিজের ঘরে সর্বত্র তার মত ও পথকে বাস্তবায়িত করা। অথচ আমরা আজ ভুলে গেছি সে মতও পথের কথা। আমাদের পুরুষরা ভুলে গেছে সে পথ। নারীরা ভুলে গেছে। যুবক ভুলে গেছে। যুবতী ভুলে গেছে। বৃদ্ধও ভুলে গেছে।

আমাদের ভাবনা এখন শুধু ক্ষমতার দিকে।

আমাদের ভাবনা সম্পদ নিয়ে,

আমাদের ভাবনা অলংকার নিয়ে। পোশাক নিয়ে। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে। পুরুষ হোক বা নারী হোক, আজ প্রত্যেক মুসলমান সম্পদের জন্য পাগল হয়ে গেছে। অথচ, এ দুনিয়াবী মোহ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাবনা ছিল যে, আমার উম্মত যেন জাহান্নামে না যায়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যথা ও ভাবনা এ উম্মতের নাজাতের জন্য ছিল। আমাদের কাজতো এটাই ছিল যে, আমরা না স্ত্রী সন্তানের, না দুনিয়ার সম্পদের পিছে সময় নষ্ট করব। আমরা তো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য জান কুরবান করব। আমাদের কাজ তো হলো মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনকে দুনিয়াতে জীবিত রাখা।

আজ আমরা কি করছি? আমাদের মাঝে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের লোভ পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান। কেউ বলে আমি নামাযী। আমি রোজাদার। হাঁ ভাই! আমরা নামাযী হই আর রোযাদার হই। নবীওয়ালা সাহাবীওয়ালা জীবন যদি গড়তে না পারি তাহলে আমি ব্যর্থ।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমি তোমাদের হাত জোড় করে বলছি, আল্লাহ্ ও তার প্রিয় হাবীবের গোলাম হয়ে যাও। আজ পুলিশ দেখলে আমরা চিনতে পারি। যে এরা পুলিশ, আর্মি দেখে চিনতে পারি যে এরা আর্মি। কারণ হলো তাদের ইউনিফর্ম। তাদের ইউনিফর্ম তাদের জাত চিনিয়ে দেয়। তেমনি ভাবে আসুন আমরাও মুহাম্মদী হয়ে যাই। আমাদের পোশাক, আমাদের আচরণ, কথাবার্তা জীবনের সর্বাবস্থায় আমরা যেন মুহাম্মদী হতে পারি, আমরা আজ থেকে সে চেষ্টাই করবো, ইন্শাআল্লাহ্।

নবীওয়ালা পথ

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণ করো। ফিরে এসো সে জীবন থেকে যে জীবনে তোমরা গন্তব্য খুঁজছো। যে জীবনে তোমরা হাটছো, এর পরিণাম শুধু ধ্বংস। আমাদের গন্তব্য তো একটাই, তা হলো, নবীওয়ালা পথ। দাওয়াত ও তাবলীগের কাফেলা বিশ্বব্যাপী এ দাওয়াত নিয়েই ঘুরছে। এ দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে কোটি কোটি দ্বীনহারা মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ পেয়েছে। এ পথে এসে কত পথহারা মুসাফির শান্তিময় জীবনের সন্ধান পেয়েছে। অপমানিতরা সম্মান পেয়েছে। শিরককারী শিরক ছেড়েছে। বেনামাযী নামাযী হয়েছে। খুনি ব্যভিচারী দাঙ্গাবাজ হয়েছে উত্তম পথের পথিক। এ পথতো এমন এক পথ, যে পথ চলে গেছে জান্নাতের দিকে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলামীতে কত স্বাদ, কত আনন্দ, তার কি বুঝবে, যে তা করেনি। আরে ভাই আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলামী করে দেখ, দেখবে। সারা দুনিয়ার বাদশাহীও এর কাছে গৌণ। এ এমন এক গোলামী, যা করে হযরত খালেদ বিন ওলিদ (রাযী.) সাইফুল্লাহ উপাধি পেয়েছেন। হযরত ওমর (রাযী.) ফারুক উপাধি পেয়েছেন। হযরত আলী (রাযী.) আসাদুল্লাহ উপাধি পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রাযী.) সিদ্দিক উপাধি পেয়েছেন। হযরত উসমান (রাযী.) জিন্নুরাইন উপাধি পেয়েছেন।

হে ভাই, এ কাজ তো নবীওয়ালা সাহাবীওয়ালা কাজ। তাবলীগ হলো এ কাজ শেখার স্থান। তাবলীগ হলো এ কাজকে দুনিয়া ব্যাপী প্রচার করা।

আর কোন নবীতো আসবে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তো শেষ নবী। তাই মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত মুহাম্মদী উম্মতের

উপর এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্ব এসে পড়েছে। দায়িত্ব এসে পড়েছে কুরআন প্রচারের। দায়িত্ব এসে পড়েছে মানুষকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার।

জিলহজ্জের দশ তারিখ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেছেন। সেইদিন সেখানে সোয়ালক্ষ সাহাবী উপস্থিত ছিলো। সেখানে নারীও ছিল। পুরুষ ছিল, ধনী ছিল, গরীব ছিল। আরবী, আজমীও ছিল। সে এক জনসমুদ্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন,

হে আমার উম্মত! তোমাদের সাথে এটা আমার শেষ সাক্ষাত। আমি তোমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামীনের জিম্মায় ছেড়ে দিচ্ছি। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। তাই আমার পয়গাম দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ আদেশ তো ঘরে বসে থাকতে দেয় না। আল্লাহ্ তায়ালার কসম, আমরা কি করছি? দ্বীনের দাওয়াত না পাওয়ার কারণে কোটি কোটি মানুষ জাহান্নামী হয়ে মারা যাচ্ছে। অথচ আমাদের কর্তব্য ছিল ঈমানের দাওয়াত নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া। যারা ঈমানের গুরুত্ব না বুঝার কারণে ইসলাম থেকে দূরে আছে। অথচ আমাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ ছিল, আমরা যেন অমুসলিমদের মাঝে ঈমানের দাওয়াত পৌছে দেই। আমরা কি সে দায়িত্ব পালন করছি? না, আমরা ঘরে বসে নিজের জীবনকে রঙীন করতে ব্যস্ত। আকাশচুম্বী ভবনের মালিক হওয়ার স্বপ্ন।

ভাই ও বোন! আসুন জান্নাতের স্বপ্ন দেখি। তওবা করি। কারণ আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের দেয়া দায়িত্ব আমরা ভুলে গেছি। আজ যদি আমরা ঈমান হারা পথভ্রষ্ট উম্মতে মুহাম্মদীকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে নবীওয়ালা পথে না আনতে পারি। তাহলে আমরা বরবাদ হয়ে যাব। যে কাজের জন্য আমাদের নির্বাচিত করা হয়েছে, যে কাজের জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি। সে দায়িত্ব পালনে আমরাতো ঘর ছাড়তে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার পয়গাম নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই আমাদের কাজ ছিল।

উম্মত তার দায়িত্ব ভুলে গেছে

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আমার জীবনতো কেটে যায় দুনিয়ার রঙীন চাকচিক্য অবলোকন করতে করতে। আজ আমরা এতই ব্যস্ত, এতই পেরেশান যে খাওয়া দাওয়ার কথাও

ভুলে যাই। যোহরের সময় চলে যায়, আসর যায় মাগরিব যায়, ইশাও চলে যায়। আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মানার সময়ও পায় না। আল্লাহ্ তায়ালার গোলামী ছেড়ে দুনিয়ার গোলামী শুরু করেছে। আজতো মানুষ চাকরীর গোলাম, ব্যবসার গোলাম, হুকুমতের গোলাম, রাজনীতির গোলাম। এসব গোলামীর শিকল আমরা এমনভাবে পড়ে নিয়েছি, এখন তা ছিন্ন করার শক্তিও আমাদে নেই। আজ দুনিয়ার মায়া মুহাব্বতের শিকলে আমরা এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে, একটা থেকে মুক্ত হলে আরেকটা এসে আটকে ফেলে। আজ আমরা বিবি বাচ্চাদের শিকলে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছি। চাকুরীর শিকলে আটকে গেছি, হুকুমত, রাজনীতি, সম্পদ, মান-সম্মান। এক কথায় দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলায় নিজেরা আটকে গেছি। আজ আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যাবার কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্ক না জুড়ানোর কারণে আমরা দুনিয়ার ঝামেলায় আটকে হা হুতাশ করছি। আজ আমরা এ পেরেশানীর শিকল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেও পারছি না, কেন জানেন? একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার পথ ছেড়ে দেয়ার কারণে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে মুসলমান আজ সব হারিয়েছে।'

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! আমাদের অবস্থাতো হয়েছে সে পাখির মত। যে পাখিকে ছোট বেলা থেকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। একদিন মালিকের দয়া হলো, পাখিটিকে মুক্ত করে দিয়ে বলে, তুই উড়ে চলে যা। আজ থেকে তুই মুক্ত। পাখি বলে, হায়! আমিতো উড়তেই ভুলে গেছি, সে ছোটবেলা থেকে তুমি আমাকে এ খাঁচার ভেতর আটকে রেখেছো। আর যদি উড়তেও পারি, তবুও তো আমার ঘর আমি চিনি না। যাব কোথায়?

আজ আমরাতো এ পাখিটির মতই সব ভুলে গেছি। আমি শুধু টাকা কামাই করাই শিখলাম। দোকান থেকে ঘর, ঘর থেকে দোকান। এ তো আমার দুনিয়ার অর্জন। না বুঝলাম সমাজকে, না বুঝলাম দ্বীনকে, না বুঝলাম উম্মতের ব্যথা বেদনাকে।

আজ আমাদের অবস্থাতো সে পাখির মতই, আমরা তো সে পাখি। আমরা দুনিয়ার ব্যস্ততায় পড়ে ভুলে গেছি আমাদের মঞ্জিল। ভুলে গেছি তাওহীদ ও রেসালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভুলে গেছি আজাদীর স্বপ্ন। ভুলে গেছি সবুজ গম্বুজের মর্মবাণী। ভুলে গেছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে দিন রাত কেন দৌড়েছেন? আমরা ভুলে গেছি, মুহাজিরে মক্কার সে আত্মত্যাগ। ভুলে গেছি আনছারে মদীনার মহানুভবতা। প্রিয় নবীর দাওয়াতী মিশনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা উত্তপ্ত মরুতে সাতরেছেন বালীর সমুদ্র। এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যারা জিহাদের ময়দানে

চলেছেন রক্তের স্রোত। ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা ভুলে গেছি, এ দ্বীন কত ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের পর্যন্ত এসেছে।

হে ভাই, ও বোন! আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমি তোমাদের উপর রাজি ও খুশি তখনই হবো, তোমাদের ঈমান তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে, তোমাদের তওবা তোমাদের আনুগত্য তোমাদের কালেমা তোমাদের ঈমান ও আমল তখনই কবুল হবে, যখন থেকে তোমরা আমার প্রিয় হাবিবের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকবে। লোক দেখানো আনুগত্য নয়, আমি সবকিছু দেখি। কিছুই আমার দৃষ্টির বাইরে নয়। শুধু মৌখিক আনুগত্য দেখালে চলবে না। নিজের দেহ, মন সব কিছুকে সপে দিতে হবে। জবান বলবে, লাব্বাইক। অন্তর বলবে, লাব্বাইক।

চিন্তা ও চেতনা সব বলবে লাব্বাইক।

আত্মা বলবে লাব্বাইক।

মোট কথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী আদর্শের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীর অনুসরণ অনুকরণে জান প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তোমার কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। নাজাতের পথ এটাই। আজ আমরা কি বোকামিই না করছি। আজ আমরা ছেড়ে দিয়েছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ ও মতকে। আমরাতো মুহাম্মদী বাগানের মালি। অথচ আমরাই এ বাগান উজার করছি। আমরা প্রতিনিয়ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে ছুড়ে ফেলছি। মুসলিম নারীরা হযরত ফাতেমা (রাযী.)এর জীবনাদর্শকে ভুলে পশ্চিমা আদর্শকে গ্রহণ করছে। অথচ সেটি কোন আদর্শই না। পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে জাহান্নাম-এর দিকে টানছে। নারীর ইজ্জত আব্রু, শালীনতাকে বিদায় করে নারীকে বাজারের পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। আমাদের মুসলমান যুবকরা পশ্চিমা অসভ্যতাকে বরণ করছে। অথচ এ সভ্যতা মানুষকে পশুত্ব আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি।

আরে ভাই! পাগলের পিছে হেটে কি কেউ গন্তব্যে পৌছতে পেরেছে? না পারেনি। ইউরোপ, আমেরিকার কালচার তো মানুষের মন মস্তিষ্ককে অসভ্যতা হিংস্রতা, আর অশ্লীলতা দিয়ে ভরে দিচ্ছে। যার কারণে আজ পৃথিবীটা রক্তের উপর ভাসছে। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ঢেউ আজ প্রতিটা ঘরকে ফুটন্ত কড়াইয়ে পরিণত করেছে। তাই এ পথে শান্তির কথা কল্পনাও করা যায় না।

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। আমাদের জন্য যে নবী সারাটা জীবন কেঁদেছেন। ইতিহাস সাক্ষি। যাও তায়েফের পাহাড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে দাওয়াত দিতে এসে পাথরের আঘাতে আহত হয়ে কেমন ছটফট করেছিলেন? সে স্থান আজও সংরক্ষিত আছে। যাও তায়েফের পাহাড়কে জিজ্ঞেস করো, যাদের আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন, তাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কতই না কেঁদেছেন। অভিশাপ দেননি। উহুদ পাহাড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, দ্বীনের জন্য তিনি কতটা আঘাত সহ্য করেছিলেন? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দাঁত দুটি শহীদ হয়েছিল। মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। ৭২ জন সাহাবীকে নিজের চোখের সামনে শহীদ হতে দেখেছেন। প্রিয় চাচা, হযরত হামযা (রাযী.), যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাইও ছিলেন। তিনি শহীদ হলেন, তার নাক কান কেটে ফেলা হয়েছিল, বুক চিড়ে কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদোয়া করেননি। এরপরও আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তাদের হিদায়েতের জন্য কেঁদেছেন। তার ফলাফল তো এ ছিল, যে হযরত হামযার খুনি ওয়াহশী মুসলমান হয়েছিলেন। খালিদ বিন ওলিদ মুসলমান হয়েছিলেন। আরও অনেকেই পরে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তো আমাদের কি হলো যে, এমন দরদী নবীর পথ ছেড়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি? যে নবী আপন চাচার খুনিকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন, সে নবীর চেয়ে প্রিয়তো আমাদের কেউ নেই।

দুনিয়া ধোঁকার ঘর

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। চিরদিন কেউ এখানে থাকেনি। যেতে হয়েছে। এ সুরম্য অট্টালিকা, এ সম্পদের পাহাড়, এ স্বজন সব ছেড়ে যেতে হবে। পথ একটাই মৃত্যু। তাই মিছে ধোঁকায় পড়ে আশার জালে পড়ে মৃত্যুকে ভুলে যেও না। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধোঁকা খেয়ো না। কারণ দুনিয়া হচ্ছে গাদ্দার, ধোঁকাবাজ। দুনিয়া নানা রঙে সেজে আমাদের ধোঁকা দেয়। কত রঙীন আশা ভরসার জালে বেধে আমাদের পরকাল ধ্বংস করে। হায় আজ সবার দৃষ্টি দুনিয়ার উপর নিবদ্ধ। দুনিয়া যেন এক সুন্দরী বধূ। আমরা সবাই তার প্রেমে আসক্ত হয়ে আছি। অথচ এ দুনিয়া কার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? দুনিয়া

কাউকে চিরদিন রাখেনি। ছুড়ে ফেলেছে। কতনা আশাবাদীকে নিরাশার যাতনা দিয়েছে।

তাই বলি, হে লোক সকল, বাস্তবতাকে বুঝতে শেখ। সত্য হলো এটাই যে, এ দুনিয়া এমন এক ধোঁকা, যার প্রেম-ভালবাসা আমাকে অপদস্ত করবে। আল্লাহ্ তায়ালাই বলেছেন, দুনিয়ার মোহাব্বত থেকে বাঁচ। দুনিয়ার নতুন কিছু আছে কি? যা পুরাতন হবে না? দুনিয়ার এমন কোন রাজত্ব আছে, যা ধ্বংস হবে না? এখানের সব প্রাচুর্য ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমার আপনার মৃত্যুর পর আমাদের সম্পদ হারিয়ে যাবে। আমার কি হবে তখন? যখন আমাকে কবরে একাকী রেখে আসবে। স্বজনরা দু'দিনপর ভুলে যাবে। আমার সম্পদ আমার কি উপকারে আসবে? যে সন্তানদের সুখের জন্য দুনিয়ার জিন্দেগীটা সম্পদের পিছে শেষ করে এসেছি। এখন সে সম্পদের মালিক সন্তানরা। আর এ সন্তানদের জন্য যে কষ্ট করেছি, কবরে আমার সে সন্তানরাই বা কি উপকারে আসবে? সন্তানদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দ্বারা ভরে দিয়েছি।

কিন্তু ঈমানতো শিখাইনি। সন্তানদের যদি দ্বীনদার বানাতে পারতাম। তাহলে মৃত্যুর পর আমার কবরে ফাতিহা পড়ত। সন্তানদের কারণে আমি সাওয়াব পেতাম। যদি এ সম্পদের কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতাম, তাহলে মৃত্যুর পরও আমার জন্য তা উপকারে আসতো।

আফসোস আমাদের। আমরা দুনিয়ার পিছে এমনভাবে ঝুকে গেছি যে, পাপের বোঝা শুধু বৃদ্ধিই করছি, নেকের ভাণ্ডার একদম শূন্য। আর এ অবস্থায়ই চলেছি পরকালের আসামি হয়ে। সে বিচারের দিনে আমার পাপের একটি কণাও কেউ নেবে না। আর নেকের একটি কণাও কেউ কাউকে দিবে না। বড় কঠিন সে দিন। শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিচারক। আমরা তার অকৃতজ্ঞ বান্দা পাপের পাহাড় নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াবো। নেকের খাতা শূন্য। পিতা তার সন্তানকে খুঁজবে একটি নেকীর জন্য। সন্তান পিতাকে খুঁজবে নেকীর জন্য। একটি নেকের সেদিন অনেক মূল্য থাকবে। পিতা দেখবে সন্তান দাঁড়িয়ে আছে, স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ভাই স্বজন কত চেনা মুখ, সেদিন কেউ কারও কাজে আসবে না। সবাই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সবাই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালার সামনে ভয়ে কাঁপবে। নিজেদের মূর্খতার কথা ভেবে। যখন দেখবে যে সম্পদ দুনিয়ায় আমার জন্য আশীর্বাদ ছিল, তা এখন বিপদের কারণ। হায় সম্পদ, যে সম্পদ দুনিয়াতে কামাই করেছিল, হালাল হারাম বাছ বিচার না করে। যে সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরও তা দেয়নি। সম্পদ কমে যাবে বলে। প্রতিবেশী গরীব

ছিল, না খেয়ে তারা কষ্ট করত, আমার থাকা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করিনি। সেদিন এসব কিছুই মনে হবে। আল্লাহ্ পাক স্মরণ করিয়ে দেবেন। অস্বীকার করার উপায় নেই। আমার আমলনামা লেখা হচ্ছে, সেদিন তা আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি কি জবাব দিবো? জবাব আমার দিতেই হবে। জবান যদিও বন্ধ রাখি কুদরতীভাবে হাত সাক্ষ্য দেবে। চোখ সাক্ষ্য দেবে। নাক সাক্ষ্য দেবে। কান সাক্ষ্য দেবে, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

সে দিন শেষ বিচারের দিবসে আমার অবস্থা কি হবে? আসুন না সে কঠিন বিপদের দিনের কথা ভেবে আমরা নিজেকে সংশোধন করি। আমার ঈমান আমলকে সুন্দর করি। অতীতের গুনাহ থেকে তওবা করি। আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা হয়ে যাই। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

হায় মরণ আমার কত কাছে!

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

আল্লাহ্ আমাদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে গাফলতী থেকে জেগে উঠার তৌফিক দান করেন। সে দিনের পূর্বেই যেন আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। যে দিন আমার কোন শুভাকাঙ্খী আমার ব্যাপারে বলবে। ভাইয়েরা, ঐ লোকটি মৃত্যু শয্যায়। তার জন্য দোয়া করুন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির কি সাধ্য আছে মালাকুল মওতের হাত থেকে বেঁচে আসে। মৃত্যুর কি কোন দাওয়াই আছে? আজ পর্যন্ত কোন ডাক্তার কবিরাজ কি পেরেছে মৃত্যুর থাবা থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনতে? পারেনি।

আমার আপনার নিঃশ্বাস জারি আছে দেহ মন সুস্থ আছে, তখন আমাদের কত বাহাদুরী। কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন অবস্থা হবে যে আমার জবান বন্ধ হয়ে গেছে। আমার হাত পা অসার হয়ে গেছে। আপনজন পাশে বসে আছে, কিন্তু হায়! কথা বলার শক্তি নেই। স্ত্রী সন্তানরা পাশেই বসে আছে, কাঁদছে, কিন্তু আমার সাধ্য নেই তাদের জড়িয়ে ধরে শান্তনা দেই। মুহূর্তের মধ্যে আমার সব বাহাদুরী শেষ।

যখন আমাদের এ অবস্থা আসবে। আমার কপালে মৃত্যুর ভয়ে ঘাম জমে যাবে। বুকের ভিতর থেকে গড় গড় শব্দ আসতে থাকবে। চোখের দৃষ্টি কমে যাবে। স্মৃতিশক্তি একদম কমে যাবে। স্বজনরা কাঁদবে। আত্মীয়-স্বজনের ভীড়

লেগে যাবে। কাফনের কাপড়ও এসে যাবে। এরপর আমাদের ঠিকানা কবরে আমাকে রেখে আসবে। একা সে ঘরে আমি থাকবো, আর থাকবে আমার কৃত আমল।

হায়! আমার বন্ধুরা, আমরা কি একবার ভাবি? যে দিন আমার জন্ম হয়েছিল, সেদিন নিষ্পাপ হয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছিলাম। আর আজ যখন এ কয়েক বছরের জীবনের সমাপ্তি টেনে চলে যাচ্ছি, তখন আমি আমার সর্বাঙ্গ পাপে জর্জরিত করে নিয়ে যাচ্ছি। রূহের জগতে শপথ করেছিলাম, মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হয়ে থাকবো। কিন্তু এখন দুনিয়া থেকে যাচ্ছি আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য হয়ে। আমাকে পাঠানো হয়েছিল একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার গোলামী করতে। এখন আমি কবরে যাচ্ছি শয়তানের গোলাম হয়ে।

বন্ধুরা! আমরাতো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আজ আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে গেছি। দুনিয়া কামাই করতে করতে আল্লাহ্ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ এ দুনিয়া একটি ধোঁকা।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) কে পত্র লিখেছিলেন।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এ ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেউ এ ঘরে চিরদিন থাকতে পারেনি। আমরাও পারবো না।

হে আমীরুল মুমিনীন! দুনিয়াকে ভয় করুন। দুনিয়া থেকে দূরে থাকুন। দুনিয়াকে যে বর্জন করতে পারল, তার জন্য দুনিয়া কল্যাণকর। দুনিয়ার এ সম্পদের কি দাম আছে। এ সম্পদতো আমার পরকালের অভাব দূর করতে পারবে না। পরকালের অভাবকে দূর করতে পারে একমাত্র নেক আমল। এ দুনিয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে কত যে আদম সন্তান জীবন বাজি রাখছে। যে দুনিয়াকে ইজ্জত দেবে, দুনিয়া তাকে অপমান করবে। যে দুনিয়া জমা করবে, দুনিয়া তাকে অভাবে ফেলবে। দুনিয়া হচ্ছে সর্বনাশা বিষ। যারা তার পরিচয় জানেনা, তারাই এ বিষ খেয়ে নিজেদের সর্বনাশ করছে। অতএব দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেভাবে কেউ তার যখমে ঔষধ ব্যবহার করে। রোগ বেড়ে যাবার ভয়ে তিতা ঔষধ ব্যবহার করে বাধ্য হয়ে। গাদ্দার ও ধোঁকাবাজ এ জগত থেকে দূরে থাকু।

অতএব হে আমীরুল মুমিনীন! এ দুনিয়া থেকে দূরে থাকুন। যত বেশি সম্ভব গোপনে ও সবধানে থাকুন। যখনই কেউ দুনিয়ার কোন সম্পদ পেয়ে উল্লাসিত হয়, তেমনি বিপদও তাকে কাঁদিয়ে ফেলে। দুনিয়ায় শক্ররা যেমন বিপদজনক, তেমনিভাবে হিতাকাঙ্ক্ষীরাও গাদ্দারী করে থাকে। এখানে সব

কিছুর ধ্বংস অনিবার্য। এ জন্যই এখানের সুখ হাজার দুঃখে ভরা থাকে। যা যায় তা ফিরে আসে না। ভবিষ্যতেও যে আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ভবিষ্যতের আশাও ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়ার আনন্দ ও বেদনাযুক্ত। স্বচ্ছতা ও ময়লাযুক্ত। জীবন সর্বদাই আশংকামুক্ত নয়। প্রকৃত বিবেক বুদ্ধি নিয়ে ভাবলে আমরা যা দেখবো দুনিয়ার সুখের যত উপকরণ আছে, সবই বিপদজনক।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বিপদ আপদ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। যদি আল্লাহ্ পাক তা নাও করতেন, তবুও দুনিয়ার রূপ দেখে বুদ্ধিমানের বিবেক জাগ্রত হওয়া উচিত ছিল। আমাদের অলস মন মস্তিষ্ক জাগ্রত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে যখন সতর্ককারী এবং উপদেশদাতা এসেছেন, তখন আমরা কিভাবে ঘুমিয়ে থাকি। এরপরও কি আমাদের ঘুমিয়ে থাকার অবকাশ আছে? ভাই ও বোন! আসুন আমরা সতর্ক হই, সংশোধিত হই। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

দুনিয়াদার সাবধান!

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এ দুনিয়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অতুলনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এ দুনিয়ার কোন মূল্য নেই। যেদিন থেকে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে আল্লাহ্ দুনিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার সকল সম্পদ ভাণ্ডার চাবি সহ তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পেশ করেছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তা গ্রহণ করতেন, তাহলে, আল্লাহ্ তায়ালার অনন্ত ভাণ্ডারের এক বিন্দু পরিমাণও কমতি আসতো না। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণ করেন নি। তিনি ভেবেছেন, দুনিয়াকে গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমের খেলাফ হবে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যা ঘৃণ্য, তাকে ভালবাসা যাবে না। মহান মালিক যে দুনিয়া সৃষ্টি করে তার দিকে একবারও নজর দেননি, দূরে নিক্ষেপ করেছেন, সে বস্তুকে তুলে নেয়া উচিত হবে না।

এ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। দুনিয়ার সবই আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দুনিয়া দান করেননি। আর অকৃতজ্ঞদের জন্য দুনিয়ার সম্পদ ঢেলে দিয়েছেন। তাদেরকে ধোঁকাগ্রস্ত করার জন্য। তাইতো ধোঁকাগ্রস্তরা এ দুনিয়ার শক্তি ও প্রাচুর্যের বলে

নিজেদেরকে অন্যদের উপর মর্যাদাবান মনে করে। তারা ভুলে যায়, জগতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, তিনি দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করেন নি, তিনি ক্ষুধার যাতনায় পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন। ক্ষুধা ছিল তাঁর নিত্য দিনের সঙ্গী। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর কিতাবে আমি পেয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ক্ষুধা আমার তরকারী, আল্লাহ্ তায়ালার ভয় আমার বৈশিষ্ট্য। পশম আমার পোশাক। চন্দ্র আমার প্রদীপ। পা যুগল আমার সাওয়ারী। আর আমি শূন্য হাতে রাত্রি যাপন করব। নিঃস্ব অবস্থায় আমার সকাল হবে। অথচ পৃথিবীতে আমার চেয়ে ধনী আর কেউ নেই।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) লিখেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)কে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাদেরকে বলেছিলেন, ফেরাউনের জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি যেন তোমাদেরকে ভীত না করে। তার ভাগ্যতো আমার হাতে। সে আমার হুকুম ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। তার ভোগ বিলাসের উপকরণ দেখেও যেন তোমরা বিস্মিত হয়ো না। কারণ, তাহলো অহংকারীদের সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ী উপকরণ মাত্র। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখভোগের সামান। তোমরা যদি তা চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এমনভাবে দুনিয়ার সুখ সৌন্দর্যের অধিকারী করে দিবো, যা দেখলে ফেরাউন ও তোমাদের শক্তির সামনে নিজেকে শক্তিহীন মনে করবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এ থেকে ফিরে আসতে বলি। দুনিয়াকে তোমাদের থেকে দূরে রাখতে চাই। আমি আমার প্রিয়দের সাথে এরকম ব্যবহারই করি। আমি তাদেরকে দুনিয়ার সুখের উপকরণাদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। যেভাবে কোন রাখাল তার বকরী পালকে বিপদজনক চারণভূমি থেকে দূরে রাখে।

আমার ওলিদের সে প্রভাব জাকজমক হতে দূরে রাখি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। যাতে তারা তাদের জন্য আমার পক্ষ হতে নির্ধারিত নিয়ামত সমূহের পূর্ণাঙ্গ অধিকারী হতে পারে। কারণ, তারা আমার ভয়ে, আমাকে ভালবেসে, নিজেদেরকে দারিদ্রতা, ভয়, বিনয় ও তাকওয়ার দ্বারা সজ্জিত করে। মূলত এ তাদের পোশাক, এ তাদের সৌন্দর্যের চাদর। তাদের জন্য নাজাতের উছিলা।

এক বুযুর্গ বলেন, আউলিয়ায়ে কিরাম, ওলামায়ে হক্কানী ও আল্লাহ্ তায়ালার পথের মুসাফিরগণ যখন জানতে পারেন যে, মহান রাব্বুল আলামীন দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দুনিয়াকে প্রত্যাখান করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণকেও দুনিয়ার ফেতনা সম্পর্কে সাবধান

করেছিলেন। তারা প্রয়োজনবশত কিছু খেয়েছেন। আর পরকালের জন্য প্রেরণ করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে নেক আমল।

সাহাবায়ে কিরামগণ দুনিয়াতে ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন, যতটুকু না হলে চলে না। আবার এমন সম্পদের দিকেও হাত বাড়াননি; যা আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়। মোটামুটি ইজ্জত আব্রু রক্ষা হয় এমন পোশাকেই তাদের লক্ষ্য ছিল। ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায় এতটুকুই ছিল তাদের খাদ্য। এ দুনিয়া যে ধ্বংসশীল, তা তাদের খেয়াল ছিল। পরকালের জীবন যে চিরস্থায়ী। তা মনে রেখেই সাহাবায়ে কিরামগণ পরকালকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দুনিয়াতে মুসাফিরের মত জীবন কাটিয়েছেন। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন। দুনিয়াকে বর্জন করে আখিরাতকে আবাদ করেছেন।

এরপর মাওলানা তারীক জামিল সাহেব বলেন, হে দুনিয়ার পথ ভোলা মুসলমান? কি করছ? কোথায় যাচ্ছো? পথতো একটাই, আখিরাত। তুমি আখিরাতকে ভুলে গেলে কি হবে? তোমার নিশ্চিত গন্তব্যতো তাই। আমি আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াস্তে তোমাদের বলছি, অন্তরকে পাথর করে রেখো না। অন্ত র থেকে পাথর সরাও। অন্তরের চোখ দিয়ে সেদিনের অবস্থা দেখো, উপলব্ধি কর। হৃদয়ে এ কথাটি বসিয়ে নাও, যে খুব শীঘ্রই আখিরাতের পথে হাঁটতে হবে। যে কোনদিন, যে কোন সময়, যে কোন মুহূর্তে।

কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۙ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۙ

তোমরা ধাবমান হও, আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৩৩)

মৃত্যুর থাবা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যু এমন এক অটল বাস্তবতা। যা দুনিয়ার সব নেশা সুখ, দুঃখ, ভোগ-বিলাসকে থামিয়ে দেয়। প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খানা নিয়ে বসল, খানা মুখে দেওয়ার সময় পায় না। মৃত্যুর শিকার হয়। কোন নিশ্চয়তা নেই, ঘন্টা, মিনিট সেকেন্ড! এরপরও কি আমরা হুশে আসছি? বলুনতো আর কত সম্পদ উপার্জন করবেন? আকাশ ছুই ছুই ইট সুরকির এ দালান, যার নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। এরপরও আপনার নেশা কাটেনি! আরও সম্পদের পিছে ছুটছেন। আপনার আকাশ ছুই ছুই দালান ক্রমে

উপরে উঠছে, আর আপনি একপা একপা করে অগ্রসর হচ্ছেন কবরের দিকে। একদিন সব ছেড়ে চলে যেতে হবে কবরে। এ সম্পদ যার জন্য এত কষ্ট এত পেরেশানী, তাতো পড়ে থাকবে দুনিয়ায়। দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে তো কবরে যাওয়া যাবে না। আর সম্পদ দিয়ে কবর ভরে দিলেও তো কোন লাভ নেই। অথচ, এ সম্পদের পিছে পড়ে ভুলেছেন আল্লাহ্ তায়ালাকে। এ সম্পদের মোহ আপনাকে আল্লাহ্ বিমুখ করে দিয়েছে। আফসোস আমাদের? কি বোকামীই না আমরা করি। এত শ্রম সাধনা আর সময় খরচ করে যে সম্পদ আমরা কামাই করি, তার সমান নেকীও যদি আমরা কামাই করতাম তাহলেও তো একটা কথা ছিল।

আখিরাতের ভাবনা তো করা প্রয়োজন। এ খেল তামাশার জীবনে আখিরাতের কথা আমরাতো ভুলেই গেছি। আমাদের তো ভাবা উচিত যে, আমরা কি করছি? আরে ভাই, নিজেকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করার জন্য দামী পোশাক ক্রয় করছি। আমি তো ভাবিনা, আমার কাফনের কাপড়ও তৈরি হয়ে আছে? একদিকে মজাদার খাবার খেয়ে খেয়ে মৌজে আছেন। আর অন্যদিকে কবরে পোকা আপনাকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। আমরা যদি ভাবতাম যে, আমার যে স্বজনটি মারা গেলো, যে প্রতিবেশী লাশ হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছে, কেন? অথচ লোকটি কালকেও সুস্থ ছিল, বাজারে গেল, অফিস করল, আজ তাকে সুন্দর ঘরটি থেকে সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে কবরে রেখে আসছে। এরপর মাটির চাদর পড়ে চিরদিনের জন্য গোপন হয়ে যায়। নিজের অস্তিত্ব এমনভাবে মুছে যায় যে, একসময় কেউই তা মনেই রাখে না। এক সময় আপনাকে ভুলে যাবে সন্তান আপনার কবরের চিহ্নও থাকবে না। পাকিস্তানের বড় বড় কবরস্থানে গিয়ে দেখুন, এমন শত শত কবর পড়ে আছে, যেগুলোর বয়স কয়েক শতাব্দী। কিন্তু সে সব কবরে একদিন ফাতিহা পড়ারও লোক নেই। কবর ওয়ালার স্বজন হয়ত বংশানুক্রমে আছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির জন্য একটু সময় তাদের হাতে কোথায়? এইতো বাস্তবতা। ভুলে যাওয়াই এ জগতের স্বাভাবিকতা। এ বাস্তবতা এ স্বাভাবিকতাটাই আমরা মাথায় প্রবেশ করাই না। আমার সামনে মানুষটা মরে গেল, লাশ কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে গেলাম, নিজের হাতে কবরে শুইয়ে রেখে আসলাম। এরপর, বাড়ি এসে গোসল করে যখন অন্য কাপড় পড়লাম– তখনই আমার মন থেকে সব মুছে গেল। আবার গা ভাসিয়ে দিলাম দুনিয়াদারীতে। অথচ একটি মৃত্যু শত শত মানুষের নসিহতের জন্য যথেষ্ট ছিল। যদি গ্রহণ করত।

আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলো, মাওলানা। তোমার চাচাকে দাফন করে আসলে? তিনি তোমাকে কিছু বলে যায়নি? মুরব্বী মানুষের প্রশ্ন। কথাটা আমার

কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো, একটু সময় নিয়ে প্রশ্নটার মর্ম অনুভব করলাম। এরপর বললাম, হে চাচা! আমার মরহুম চাচা আমাকে আপনাকে সকলকেই বলে গেছেন, যে হে দুনিয়ার গাফেলগণ! দুনিয়া থাকার জায়গা নয়। যত চেষ্টাই করো এটা অল্প দিনের আবাস। একদিন তোমাকেও এ খাটিয়ায় চড়ে কবরে দাফন হতে হবে। তাই সাবধান! আমাকে দেখে শিক্ষা নাও। আর পুঁজি ছাড়া কবরে এসো না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযী.) বর্ণনা করেন যে, সালাবাহ ইবনে হাতেব নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলো, হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল! আপনি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে আমি ধনী হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাবার-এ কথা শুনে বলেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? তুমি কি আল্লাহ্ তায়ালার নবীর আদর্শের উপর থাকতে আগ্রহী নও?

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শোন হে সালাবা! সে পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্মাধীন আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে এ পাহাড়সমূহ সোনা রূপায় পরিণত হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দনীয় নয়।

এরপর সালাবাহ বললো, যে পবিত্রসত্তা আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তার কসম, যদি আপনি দোয়া করেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও প্রাপ্য পৌছে দেব এবং আরও অন্যান্য নেক কাজও করব।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন, আয় আল্লাহ্! সালাবাকে সম্পদ দান করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়াটুকুই করেন। এরপর থেকে সালাবার সম্পদের ব্যাপক বৃদ্ধি শুরু হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তার ভেড়া বকরী উট এমনভাবে বৃদ্ধি পেল যে, মদীনায় তার বসবাসের স্থানটি সংকীর্ণ হয়ে যায়। তখন সে মদীনার বাইরে একটি বড় জায়গা নিয়ে বসবাস করতে থাকে। সালাবাহ এখানে আসার পর থেকে শুধু যোহর ও আসর এ দুই ওয়াক্ত নামায মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জামাতে আদায় করত। আর বাকি নামাযগুলো তার বাসস্থানেই পড়ে

নিত। এক সময় তার ছাগল ভেড়ার পাল আরও বৃদ্ধি পেল। যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার জন্য সংকুলান হয় না। তাই সে মদীনা শহর থেকে আরও দূরে গিয়ে বিশাল এক জায়গা নিয়ে বসবাস শুরু করে। সেখান থেকে শুধু জুমআর নামায পড়তে মদীনায় আসতো। আর বাকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানেই পড়তো।

এরপর তার সম্পদ কিড়ার মত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন তাকে সে জায়গাও ছাড়তে হলো। এখন সে মদীনার বাইরে চলে যায়। সেখানকার দূরত্ব তাকে জুমআর নামায মদীনায় পড়া থেকেও বঞ্চিত করে। জুমআর দিন মদীনা থেকে জুমআ পড়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের কাছে কেবল জিজ্ঞেসাবাদ করে সেখানকার অবস্থা জেনে নিত।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের কাছে সালাবাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে, তারা বললো, যে তার মালামাল এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে মদীনার সীমানা ছেড়ে বহু দূরে একস্থানে বসবাস করছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বলেন, সালাবার প্রতি আফসোস, সালাবার প্রতি আফসোস।

এর কিছুদিন পরই সদকা আদায় করা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ

আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন। যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক পবিত্র করে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির কারণ। (সূরা তওবা-১০৩)

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের জন্য সদকার যথাযথ আইন নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন লোককে মুসলমানদের কাছে থেকে সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং দু'জনের কাছেই লিখিত ফরমান দিয়ে দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলে দেন, তোমরা সালাবার কাছে যাও। এছাড়া বনী সুলাইম গোত্রের আরও এক লোকের কাছে যাবার হুকুম দেন। তাদের কাছ থেকে সদকা উসুল করার আদেশ দেন।

তারা উভয়ে যখন সালাবার কাছে গিয়ে পৌছল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লিখিত ফরমান দেখাল। সালাবা তখন বলতে থাকে,

এতো জিজিয়াকর হয়ে গেল, এতো জিজিয়া কর হয়ে গেল। এতো জিজিয়ার মতই আরেকটা। এরপর সালাবা বলে, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এদিকে হয়ে যাবেন। এরপর লোক দু'টি সুলাইম গোত্রের লোকটির কাছে গেল। লোকটি তাদের কথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরমান দেখে নিজের পালিত পশুসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী তাদের কাছে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেরণ করা লোক দু'জন পশুগুলো দেখে বলে, আপনার উপর এত সুন্দর উৎকৃষ্ট পশু সদকা করা ওয়াজিব নয় এবং আমরাও আপনার কাছে থেকে এগুলো নিতে পারিনা। সুলাইম গোত্রের লোকটি বিনয়ের সাথে বলে, এগুলো আমি খুশি হয়ে দিয়েছি।

এরপর দু'উসুলকারী অন্যান্য মুসলমানদের কাছে থেকে সদকা উসুল করে সালাবাহর কাছে আসলো এবং তার কাছে পুনরায় সদকার কথা বলে। তখন সালাবা বলে, দাও দেখি, সদকার আইনগুলো একটু পড়ে দেখি কি লেখা আছে। তা দেখে সে পূর্বের মতই বলতে থাকে। এটাতো একরকম জিজিয়া করই। যা হোক আপনারা এখন চলে যান, আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখি।

লোক দু'টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কুশল জিজ্ঞেস না করেই বলতে লাগলেন يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ

সালাবার প্রতি আফসোস।

এভাবে তিনবার বলেন। এরপর সুলাইমীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য দোয়া করেন। এরপর তারা দু'জন সালাবাহ ও সুলাইমীর সাথে যা হয়েছে তা বললো।

তখনই সালাবা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তাহলে তারা দান খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করেন। তখন কার্পণ্য করতে থাকে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য বিমুখ হয়ে গেল। তার পর এরই পরিণতিতে

তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থান করে নিল। সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তার সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছে এবং এজন্য যে তারা মিথ্যা কথা বলত (সূরা তওবা-৭৫, ৭৬, ৭৭)

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সালাবার কতিপয় আত্মীয় স্বজন সে মজলিসে উপস্থি ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন সঙ্গে সঙ্গে সালাবার কাছে গিয়ে সংবাদ দিল, সালাবাকে ভর্ৎসনা করে বলে, তোমার সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। একথা শুনে সালাবা উদ্বিগ্ন হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সদকা গ্রহণ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তোমার সদকা কবুল কতে নিষেধ করেছেন। সালাবা এ কথা শুনে নিজের মাথায় নিজেই মাটি নিক্ষেপ করতে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটাতো তোমার নিজেরই কর্মফল। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম তুমি তা পালন করোনি। এখন তোমার সদকা কবুল হতে পারে না।

তার কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রাযী.) খলীফা হলেন। সালাবা হযরত আবু বকর (রাযী.) এর কাছে এলো। আবেদন করল সদকা গ্রহণ করার জন্য। সিদ্দিকে আকবর (রাযী.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যেটা কবুল করেননি, তা আমি কিভাবে কবুল করব? হযরত আবু বকর (রাযী.) এর ওফাতের পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাযী.) এর খিদমতে সালাবা তার সদকা গ্রহণ করার আরজি পেশ করল। উমর (রাযী.) ও হযরত আবু বকর (রাযী.)এর মতই উত্তর দেন। এরপর হযরত উসমান (রাযী.) এর খেলাফত কালে সে একই আবেদন করে। উসমান (রাযী.) তার সদকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রাযী.) এর খেলাফত কালেই তার মৃত্যু হয়।

এ হলো দুনিয়ার সম্পদের অপকারিতা। দুনিয়ার সম্পদ মানুষকে আল্লাহ্ বিমুখ করে দেয়। গাফেল করে দেয়। সম্পদের পিছে ছুটতে ছুটতে দ্বীন ভুলে যায়। নামায রোযা ভুলে যায়। সম্পদের যে ইবাদত সেটি হলো যাকাত, সম্পদওয়ালারা তাও দিতে চায় না। যদি সম্পদ কমে যায়!

আরে ভাই! সম্পদতো আপনার নয়, আপনাকে আল্লাহ্ পাক তা দিয়েছেন, এটার মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, মুহূর্তে এ সম্পদ আপনার কাছে থেকে কেড়ে নিতে পারেন। এ দুনিয়ার কত সম্পদওয়ালাকে দেখেছি

কয়েক দিনের ব্যবধানে পথের ফকির হয়ে যেতে। সম্পদতো গেছেই। এখন ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পাগলের মত ঘুরছে। ভাই এ সবই আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের না শোকরীর কারণে হয়। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জান, আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া মাল, আল্লাহ্ তায়ালার পথে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই তো আমরা বরকতময় জীবনের সন্ধান পাব। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন-আমীন।

আযাবের ভয়, রহমতের আশা

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম অমান্য করে তাদের ভয় হওয়া উচিত যে, কখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে। বা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়। (সূরা নূর-৬৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা যখন আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতাও গুনাহের কাজে লিপ্ত হই, তখন যদি আমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় থাকে তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ। মহান রাব্বুল আলামীনের অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী বিষয় হলো আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের কথা স্মরণ রাখা। আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টিও তাঁর পাকড়াওয়ের কথা মনে রাখা।

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুমুর্ষ যুবকের কাছে তাশরীফ নিয়ে যান। যুবকটি তখন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটিকে জিজ্ঞেস করেন, এ মুহূর্তে তোমার অনুভূতি কেমন। যুবকটি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মনে আশার সঞ্চার হয়। আবার গুনাহের কারণে ভয়ও অনুভব করি।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরূপ অবস্থা কোন বান্দার অন্তরে উদয় হলে আল্লাহ্ পাক তাকে অবশ্যই আশানুরূপ ফলদান করবেন এবং যে বিষয় থেকে সে ভয় করতো তা থেকে তাকে মুক্তি দেবেন।

আল্লাহ্ তায়ালার নবী হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, জান্নাতের আকাংখা এবং জাহান্নামের ভয় মানুষকে ধৈর্য্য ধারণ, দুনিয়াবী আরাম আয়েশ থেকে বিরত রাখে। প্রবৃত্তির বিরোধীতা এবং পাপাচার পরিহারে অভ্যস্ত করে তোলে। সাইয়্যিদানা হযরত হাসান (রাযী.) বলেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মহান ব্যক্তিগণ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছেন, তারা সমস্ত জীবন অসংখ্য কংকর পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় দান করে ও গুনাহের ভয়ে তটস্থ থাকতেন। পরকালে কি হবে, তার চিন্তায় অস্থির থাকতেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন। আমি যা শুনতে পাই, তোমরা কি তা শুনতে পাও? আমি শুনছি আকাশমণ্ডলী কড়কড় আওয়াজ করছে। সে পবিত্র সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মহান আল্লাহ্ তায়ালার সামনে সিজদা অথবা দাঁড়ানো, অথবা রুকু অবস্থায় মগ্ন না আছে। আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা অধিক পরিমাণে কাঁদতে এবং হাসি তামাশা করতে না। আর তোমরা জনপদ ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে চলে যেতে। সেখানে তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ভয়াবহ আযাব গজব থেকে পানাহ্ চাইতে।

তো ভাই, আমরা কেউ বলতে পারিনা, বলা সম্ভবও না। পরকালে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমরা দোষী সাব্যস্ত হবো না নির্দোষ।

হযরত উমর ফারুক (রাযী.) যখন ঘাতকের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বলেন, ওহে! আমার মাথাটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে রাখ, জানিনা আখিরাতে আমার কি পরিণতি হবে? সেদিন যদি আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে রহম না করেন, তাহলে আমার কোন উপায় নেই। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছেন কেন?

আপনি একজন মহান বিজেতা। আল্লাহ্ তায়ালা আপনার দ্বারা প্রচুর এলাকা মুসলমানদের হাতে এনে দিয়েছে। বহু শহর আপনার দ্বারা আবাদ করিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলাম ও মুসলমানদের আরও অনেক উপকার আপনার দ্বারা সাধিত হয়েছে। এরপর হযরত উমর (রাযী.) বলেন, আমি শুধু নাজাতটুকু পেতে চাই। কোন অপরাধে যেন ধরা না পড়ি।

ইমাম হযরত যায়নুল আবেদীন (রহ.) যখন ওযু শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন থরথর করে কাঁপতে থাকতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, তোমরা কি জান না, আমি কত বড় মহান সত্তার দরবারে দণ্ডায়মান হবো? এবং তার কাছে একান্তে আবেদন করবো, মাফ চাবো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এ ছিল আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা। তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। এরপরও আমাদের অন্তরে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দেয়া এ জীবনে আমরা একবারও স্মরণ করিনা মৃত্যুকে। সেখানে আমার কোন ইচ্ছা শক্তি কাজে আসবে না। মৃত্যুর কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা আমাদের জন্য নির্ধারিত। হারিয়ে যাবো মাটির গভীরে। শরীরের হাড়গুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়বে। কবরের গরম হাড়গুলোকে মোমের

মত গলিয়ে দেবে। সুতরাং সাবধান! মৃত্যু আসবেই। মৃত্যু থেকে আমরা গাফেল হলে কি হবে? মৃত্যু তো আমাদের ভুলেনা। তাই আসুন, আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহশীল যিনি, সে মহান আল্লাহ্ তায়ালার পথে চলি। আজ আমরা শয়তানের গোলাম হয়ে তার পথে ছুটছি। অথচ সে পথ জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের পরকালকে রক্ষা করি। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন আমীন।

একটি ঘটনা

ঘটনাটি বালাকোট অঞ্চলের। শহরের কিছু বাসিন্দা রমজান মাসে অভিজাত একটি হোটেলে নাচ গানের আয়োজন করল। দেশ বিখ্যাত নর্তকী আনা হলো। নামকরা শিল্পী আনা হলো। পবিত্র রমজান মাস। মদ আর উলঙ্গ নৃত্যের মজলিস তখন পুরা গরম। এ আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাদের না পবিত্র রমজান মাসের কথা স্মরণ আছে। না নিজেরা রোজা রেখেছে। তাদের মনে আসেনি এ রমজান মাস। মাগফেরাতের রহমতের ও নাজাতের মাস। এ মাসে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বান্দার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন, মাগফেরাতের দরজা খুলে দেন, জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দেন। অথচ এ মানুষগুলো উল্টো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ক্রোধকে ডেকে আনলো। মজলিস চলছে, নর্তকী নাচছে, শিল্পী গান গাইছে। পেয়ালার পর পেয়ালা মদ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, জীবন আর ক'দিনের, ফুর্তি করে নাও।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ক্রোধকে তারা ডেকে আনলো। আল্লাহ্ তায়ালা জমিনকে আদেশ দেন, জমিন কেঁপে উঠল। এক পাহাড়ের সাথে আরেক পাহাড়ের টক্কর। শুরু হয়ে যায় আল্লাহ্ তায়ালার গজব। সে পাঁচ তারকা হোটেলটি ভূমিকম্পের এক ঝাটকায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পূর্বেও যেখানে শত শত প্রাণের স্পন্দন ছিল। আনন্দ স্ফূর্তিতে মাতাল ছিল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে তা অসতর্ক বান্দাদের জন্য শিক্ষার এক উপকরণ হয়ে রইল। এরপরও যদি আমরা সাবধান না হই, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার রহমানু রাহীমের নামের সাথে সাথে তিনি যে জাব্বার, কাহ্হার তা জানা হয়ে যাবে।

উম্মূল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযী.) কে ভূমিকম্প বা সুনামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে। তিনি বলেন, ঈমানদার মুসলমানের জন্য এটা হলো শিক্ষা। আর কাফেরদের জন্য এটা হলো আযাব। মানুষের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় হয়ে আমাদের উপর পড়ে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে মাফ করুন, আমীন।

আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কান্না

মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবীবকে আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তার জীবনাদর্শ গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য কেঁদেছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। এরপরও উম্মতের মুক্তির চিন্তায় পেরেশান ছিলেন। তার চাইতে দয়ালু কোন মানুষ পৃথিবীতে আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উম্মতের প্রতিটা নারী পুরুষের জন্য কেঁদেছেন। এ উম্মতের প্রতিটা নারী ও পুরুষের মুক্তি চিন্তায় প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ তেইশটি বছর কষ্ট করেছেন, কেঁদেছেন। অথচ আজ আমরা তার আদর্শকে জবাই করছি। এ পৃথিবীতে এমন একজন মা কি আছে যে সন্তানের জন্য তেইশ বছর বা তেইশ মাস কেঁদেছে? অথচ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের মুক্তির জন্য তেইশ বছর কেঁদেছেন। আমরা তাঁর উম্মত, কি মর্যাদা দিলাম আমরা সে মহান দয়ালু মানুষটির পবিত্র চোখের পানির! আমরা কি মর্যাদা দিলাম সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র রক্তের, যা তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনতে ঝারিয়েছেন।

আফসোস মুসলমান! আজ আমরা কোথায় দৌড়াচ্ছি? সে দয়ার নবীর আদর্শ ছেড়ে আমরা ছুটছি অভিশপ্ত অন্য মতবাদের দিকে? এসব মতবাদ, আদর্শ কি দুনিয়ায় কোন শান্তি কায়েম করতে পেরেছে কোন কালে? পারেনি। এসব নাপাক মতবাদ শুধু তৈরি করেছে বিভেদ আর হিংসা ও ধ্বংসের তুফান।

আমার কষ্ট হয়, যখন দেখি মুসলমানের সন্তানরা কার্লমার্কস, মাও সেতুং আর লেলিনের নামে শ্লোগান তুলে মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়। মসজিদ মাদরাসার বিরুদ্ধে দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। অথচ এ ছেলেগুলোই সে ছোট্ট বেলায় যখন মক্তবে যেত, আলিফ বা-তা, পড়ত। পিতামাতা কত খুশি হতো। সন্তানটি পবিত্র কোরআনের প্রথম সবক নিত। তখন ধার্মিক পিতার কি আনন্দ, বাজার থেকে মিষ্টি এনে সবাইকে খাওয়াতো।

অথচ সে সন্তানই আজ কাফেরদের চক্রান্তে পড়ে পবিত্র কোরআন শরীফকে অস্বীকার করছে। হারিয়ে ফেলছে নিজেদের স্বকীয়তা। এ কারণেই আজ মুসলমানরা পৃথিবীর বুকে অপমানিত লাঞ্ছিত। যতদিন মুসলমানরা প্রিয় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল, বিশ্ব ছিল তাদের পদানত। অর্ধ পৃথিবীরও বেশি অঞ্চল ছিল তাদের হাতের মুঠোয়।

আজ পৃথিবীর মুসলমানরা যখন নবীর আদর্শকে ভুলে গেল, দাওয়াত ভুলে গেল। দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজেদেরকে কাফেরদের রঙে রঙীন করল, তখন থেকেই শুরু হলো পতন। আমাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজ বেনিয়ারা দুইশত বছর আমাদের রক্ত চুষে গেল। আমাদের তাহযীব তমদ্দুনকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। সে দুর্ভোগ আমাদের এখনও কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। বিশ্বের মুসলমানরা আজ দিশেহারা। হা হুতাশ করছে। মুক্তির পথ খুঁজছে।

আরে ভাই মুক্তিতো রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। পথ তো একটাই। তাহলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ। যে পথে আমরা ফিরে পাব হারানো সম্মান। ফিরে পাব শান্তি ও মুক্তির পথ। তা কিভাবে করতে হবে, তিনি তা নিজে করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

দাওয়াতের মাধ্যমে, বাধা এসেছে, হামলা হয়েছে, ধৈর্য্য ধরেছেন, কয়েক বছর। নির্যাতনের চরম মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে প্রতিরোধের জন্য তরবারীও ধরতে হয়েছিল্

দ্বীন প্রচারে বাধা আসবেই

আমরা মনে করি দ্বীন ইসলাম খুব সহজেই কায়েম হয়ে যাবে। ঘরে বসে থাকলাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লাম, সংসার সামলালাম, তো আমার দায়িত্ব শেষ। না ভাই, আমার দায়িত্ব শেষ হয়নি। দায়িত্বে কিছুই পালন করিনি। দ্বীন যদি এত সহজই হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তাক্ত হতেন না। উহুদ যুদ্ধে দাঁত মুবারক শহীদ হতো না। দ্বীন প্রচারে গিয়ে সত্তর জন মুবাল্লেগ সাহাবী শহীদ হতেন না।

ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী পড়ুন। দেখুন, তিনি দ্বীনের জন্য কত কষ্ট করেছেন। মক্কার অলিগলি ঘুরে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করো, আমি আল্লাহ্ তায়ালার বার্তাবাহক। হাতে গড়া এ পাথরের মূর্তির পূজা করো না। মক্কার কাফেররা ক্ষেপে গেল। সে মহান মানুষটিকে গালমন্দ করল, পাগল বললো, যাদুকর বললো। যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের উপর নির্যাতন চালাল। হযরত সুমাইয়াকে শহীদ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে যান, সেখানে কাফেররা তাকে পাথর

মেরে রক্তাক্ত করল। আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল তাও দাওয়াতী কাজ বন্ধ করলেন না। এক সময় এ দাওয়াতের কারণে ঈমানদারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাফেররাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হুকুম হলো, হে নবী! আপনি হিযরত করুন, মদীনায়। মদীনার বহু ভাগ্যবান পূর্বেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েলেন। আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্ধু হযরত আবু বকর (রাযী.) কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিযরত করেন। দ্বীনের কাজ এগিয়ে চলল। সেখানেও বাধা এলো। মদীনার ইহুদীরা চক্রান্ত শুরু করল। মদীনার ইহুদীরা মক্কার কাফেরদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্য্য ধরে ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাড়তে থাকল মুসলমানের সংখ্যা। কুফফার শক্তির সহ্য হলো না। মক্কার কাফেররা মদীনার দিকে মার্চ করল। মুসলমানদের চিরতরে খতম করার উদ্দেশ্যে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন, তার পরও তিনি ধৈর্য্য ধরলেন। এমন সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দেন, হে নবী! জিহাদ করুন। প্রতিরোধ করুন।

বদরের ময়দানে তিনশত তের জন সাহাবী নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের মোকাবেলায় হাজির হলেন। সে সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সিজদায় পড়ে কেঁদেছেন, বলেছেন, আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে বিজয়ী কর। উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। উম্মতের বিজয়ের জন্য কেঁদেছেন। কারণ, সেদিন যদি মুসলমানরা পরাজিত হতো তাহলে ইসলামের জ্বলন্ত মশালকে কাফেররা নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করত। আর এ দাওয়াতি মিশন থেমে গেলে পথহারা এ উম্মতের কি উপায় হতো?

হে মুসলমান! শোন, ইতিহাস বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে উম্মতের মুক্তির জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমাদের জন্য কেঁদেছেন। অথচ আমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ উম্মত। আমরা তার পবিত্র চোখের পানির অমর্যাদা করছি। তাঁর পবিত্র রক্তের অমর্যাদা করছি। হে মুসলমান! আমি বলি, দেড় হাজার বছর পূর্বের মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখ। তিনি এমন এক মহান মানুষ। যার জন্য সারা পৃথিবী কোরবান। সে মহান বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর যেখানেই পা রাখেন, সেখানেই শান্তির

সুবাতাস বইতে থাকে। তিনি তাঁর পবিত্র মাথা যেখানেই রাখেন, সেখানেই সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত ফুলবাগানে রূপান্তরিত হয়। যিনি মাটির পৃথিবীতে জান্নাত, জাহান্নাম দেখতে পান। আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয়তম দোস্ত। যার মর্যাদার দ্যুতি সমগ্র জগত থেকে শুরু করে প্রথম আসমান, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে সপ্তম আকাশ। এরপর সিদারাতুল মুনতাহা, এরপর আরশে মুয়াল্লা। এখানেই শেষ নয় তাঁর মঞ্জিল। তাঁর পথতো সে পর্যন্ত, যেখানে সত্তর হাজার নূরের পর্দা উন্মোচিত হয়ে ধীরে ধীরে মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাত।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

এত মহান যার মর্যাদা, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার আমার জন্য মদীনায় বসে কেঁদেছেন। তিনি আমাদের জন্য এতই কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের জলে দাঁড়ি ভিজে যেতো। ভিজে যেত বক্ষ মোবারক। তিনি আরাফায় কেঁদেছেন, মিনায় কেঁদেছেন। বাইতুল্লায় কেঁদেছেন। মধ্যরাতে তাঁর কান্নায় জোশ উঠে যেতো আরশে আজীমেও। কেঁদে কেঁদে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলতেন, মাফ করে দাও। ঈসা (আ.) বলেছিলেন, মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্! আমিও বলছি,

أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ

আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। একথা বলে তিনি এমনভাবে কাঁদতেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) ছুটে আসতেন। বলতেন, আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করেছেন, হে নবী! আপনার কি হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার গুনাহগার উম্মতের ভাবনা আমাকে কাঁদাচ্ছে। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলতেন, কাঁদতে হবে না। আপনাকে আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশি করে দেব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ থেকে আমরা সরে গেছি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আসুন আমরা একটু ভেবে দেখি, আমরা কি করছি? যিনি আমাদের মুক্তির জন্য এত কেঁদেছেন। এতটা পেরেশান ছিলেন, এতটা ভেবেছেন, তার আদর্শকে ভুলে গেছি। আমাদের অন্তর যদি মরে গিয়ে না থাকে, আমাদের অন্তর যদি

পাথর না হয়ে থাকে, আমরা যদি বিবেকবান হয়ে থাকি, তাহলে এ অন্তর অবশ্যই বলবে, আমরা যা করছি সবই ভুল। আজ আমরা যা করছি, মুসলমান হিসেবে তা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হতে পারেনা।

এ যে আমরা আমাদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে বিজাতীয় কালচার লালন করছি, ইসলামী শরীয়তের সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? এ যে বিয়ে শাদীতে গায়ে হলুদের নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি পালন করছি। মেহেদী উৎসবের নামে উলঙ্গপনা করছি। জন্মদিন পালনের নামে হাজার হাজার টাকার অপচয় করছি। মৃত্যু বার্ষিকীর নামে উরস করছি। মাজারের নামে শিরক করছি। কবরে আগর বাতি মোমবাতী জালিয়ে যা করছি, তা তো পরিষ্কার শিরক। আজতো দেখা যায়, মাজারগুলোতে নারী পুরুষ বেপর্দা হয়ে গান-বাজনা করছে, সিজদা করছে।

মাজারের নামে মানত করছে। এ সব শিরক আজ দেদারছে পালন হচ্ছে। সরল প্রাণ মুসলমানেরা এসব ভণ্ডদের খপ্পরে পড়ে ঈমান আমল সব বরবাদ করছে। সাবধান মুসলমান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন, যে ব্যক্তি কবরে বাতি জ্বালায়। কবর জেয়ারতকারী মহিলাকে। মাজারে সিজদাকারীকে। আপনারা এসব করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লানতের মধ্যে পড়েবন না। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করে নিজেকে অভিশপ্ত করবেন না। নিজের ঈমান আমলকে হিফাজত করুন। সে দিনের কথা ভাবুন। যেদিন আপনাকে মহান আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। জবাব দিতে হবে প্রতিটা কাজের। প্রতিটা সেকেন্ডের। জবাব দিতেই হবে। কি জবাব দিবো? জীবনে কত পাপ করেছি। শিরক করেছি। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে না চেয়ে চেয়েছি মৃত আত্মার কাছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সিজদা না করে করেছি মৃত পীরকে।

আজ কিছু কিছু অতি উৎসাহী মানুষ মাজার, কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে। মাজারকে আলোকিত করে মোমবাতি জ্বালিয়ে। মাজারকে সুবাসিত করে আগরবাতি আর গোলাপজল দিয়ে। হায় মূর্খ! অন্যের কবরে বাতি না জ্বালিয়ে নিজের কবরের চিন্তা করো। চিন্তা করে দেখা, নিজের কবরকে আলোকিত করার মতো আমল তোমার কামাই হয়েছে কিনা! নিজের কবর সুবাসিত করার রসদ তোমার অর্জন হয়েছে কিনা! যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কি লাভ অন্যের কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করে। সে কঠিন হাশরের দিনে তোমার কৃতকর্মের জবাব তোমাকেই দিতে হবে। নিজের আমল যদি শূন্য থাকে তাহলে পীর সেদিন তোমাকে কোন উপকারই করতে পারবে না। অথচ এ

পীর তোমাকে টেনে নিয়ে গেছে শিরিকের পথে। সেদিন তোমার আমল তোমাকে বাঁচাবে। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। সেদিন সবাই নিজেকে নিয়ে পেরেশান থাকবে।

সেখানে সবাই একাকী হবে। মা সন্তানকে ভুলে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না। সন্তানরা সঙ্গ ছেড়ে দেবে। বন্ধুরাও মুখ ফিরিয়ে নিবে। সকলেই ভাববে নিজের কথা। হাত কথা বলবে, হে আল্লাহ্! আমি এ হাত দ্বারা অন্যায় করেছিলাম, পা বলবে, আমি তোমার অবাধ্য হয়েছিলাম। পেট কথা বলবে, প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অপরাধী সেদিন এ বলে আক্ষেপ করবে।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ

অপরাধী সেদিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততিকে।

(মায়ারিজ) ১১

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝

তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী যারা তাকে আশ্রয় দিত।

(সূরা মায়ারীজ–১২, ১৩)

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

এবং পৃথিবীর সকলকে। (মায়ারীজ ১৪)

অপরাধীরা সেদিন বলবে– পৃথিবীর সকল মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে হলেও আমাকে বাঁচাও আল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার পরিষ্কার জবাব।

كَلَّا- না। কখনো না, (সূরা মায়ারীজ, ১৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদের লক্ষ্য তো হওয়া উচিত আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তায়ালার অপছন্দের পথ পরিহার করে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন, সেভাবে জীবনকে সাজানো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টিতে ভরা যে জীবন, তা কোন জীবনই না। এমন জীবনের কোন মূল্য নেই।

মরে গেলাম তো আমার আর কোন উপায় থাকলো না। আমলবিহীন কবরে যাওয়া মানে নিজেকে জাহান্নামের ইন্ধন বানানো। তাই সকলের উচিত পরকালের পুঁজি সংগ্রহ করে কবরে যাওয়া।

মহান রাব্বুল আলামীন পরম দয়ালু। তিনি বান্দার সব কিছুই জানেন। তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করাই আমাদের মূল কাজ। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমাদের সম্পর্ক জোড়া লাগানোরও তো এখনই সময়। তিনিতো আমাদের জন্যই কেঁদেছেন। পেটে পাথর বেঁধেছেন। তালিযুক্ত জামা পড়েছেন। এত কষ্ট করেছেন যেন আমরা জান্নাতের পথে ফিরে আসি। যেন আমরা বিপদগ্রস্থ না হই। সুতরাং আসুন আমরা নিজকে তার আদর্শে গড়ে তুলি। তাহলেই আমরা পাব সুন্দর সুশৃংখল সমাজ, সুন্দর দেশ। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কিরামগণের ত্যাগ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের স্ত্রী সন্তানগণের কথা ভেবে দেখুন। দ্বীনের জন্য তারা অতুলনীয় কুরবানী দিয়েছেন। নিজেদের জীবন নিজেদের সম্পদ সব হারাতে হয়েছে। তবুও ঈমানের কুরবানী দেননি। তারা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন, যে, মুসলমান দুনিয়াতে সম্পদ কামাই করতে করতে কবরে যাবার জন্য আসেনি। মুসলমানের লক্ষ্য হলো কালেমার বাণী পৃথিবী ব্যাপি ছড়িয়ে দেয়া। কালেমার পতাকা উঁচু করা।

সে সময়ের মায়েরা ছেলেদেরকে জেহাদে প্রেরণ করতেন আর বলতেন, যাও আল্লাহ্ তায়ালার পথে নিজেকে কোরবান করে দাও। স্ত্রী-স্বামীকে বলতো, যাও, আল্লাহ্ তায়ালার পথে নিজের জীবনকে কুরবান করে দাও।

সে যুগের মহিলারা তাদের কোমল হৃদয়খানাকে পাথর বানিয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের জন্য যেকোন কুরবানী দিতে তারা তৈরী থাকতো। সে যুগের মহিয়সী নারীরা যদি কোমল হৃদয়কে পাথর না বানাত, তাহলে আজ দুনিয়াতে কালেমা পড়ার মত কেউ থাকতো না।

তাদেরও তো বাসনা ছিল, নয়নের মণি, প্রিয় সন্তানটি তাদের চোখের সামনে থাকবে। স্ত্রীরও কামনা ছিল, তার সুখ দুঃখের সাথী হয়ে প্রাণপ্রিয় স্বামী তাদের ছেড়ে কোথাও না যাক। কিন্তু তারা সব চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বুকে পাথরচাপা দিয়ে মা বলেছেন, যাও, বাছাধন। স্ত্রী বলেছে যাও আমার মাথার তাজ, আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের জন্য নিজেকে কুরবান করে দাও। আমরা তোমাদের বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে পারব। আমরা ধৈর্য্যধারণ করব।

হযরত উম্মে ফজল এর কথা চিন্তা করুন। তিনি হযরত আব্বাস (রাযী.) এর স্ত্রী। তাদের দশ পুত্র ছিল। সবাই আল্লাহ্ তায়ালার পথে শহীদ হয়েছেন।

ফজল ইবনে আব্বাস (রাযী.) শামে (বর্তমান সিরিয়া) শহীদ হয়েছেন।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) ইয়েমেনে শহীদ হয়েছেন।

আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস (রাযী.) আফ্রিকায় শহীদ হয়েছেন।

কাদাম ইবনে আব্বাস (রাযী.) সমরকন্দে শহীদ হয়েছেন।

কাছির ইবনে আব্বাস (রাযী.) ইয়ানবুতে শহীদ হয়েছেন।

কোন সন্তানই মায়ের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করেনি। তাদের একেকজনের কবর একেক স্থানে।

সে যুগের মহিলারা যদি এ যুগের মহিলাদের মত হতেন, তাহলে আজ এ জগতে আল্লাহ্ তায়ালার নাম উচ্চারণ করার মত কেউ থাকতো না।

সে যুগের মায়েরাও যদি বলতেন, আমাদের ছেলেরা ব্যবসায়ী হবে। স্ত্রীরা যদি বলতেন, আমাদের স্বামীকে আমরা চোখের আড়াল হতে দেবনা, তাহলে আজ দুনিয়াতে ইসলাম থাকতো না। ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌছতো না।

তারা আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনকে সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিতে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন। ক্ষুধায় কষ্ট করেছেন। তাদের ঘর শূন্য ছিল। তাদের ঘরে খাওয়ার মত কোন রুটি ছিল না। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতেন। এরপরও ঈমানের দাবী পূরণ করতে পিছপা হননি। তাদের কাছে ঈমান ছিল সবার আগে। তারা তাদের অন্তরে এ চেতনাকে ধারণ করেছিলেন, যে আমাদের আর কোন কাজ নেই। আমাদের কাজ হলো আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের জীবন-মরণ আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের উপর।

সেদিন আমি একা হয়ে যাব

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন!

এ দুনিয়ার বুকে কতদিনই বা বাঁচব? আমার হিসেবে ষাট, সত্তর আশি, অথবা একশত তারও কিছু বেশি বছর। অথচ এ জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় কিছুই না। একদিন বা তার চেয়েও কম। অথচ আমরা একটা দিনে আল্লাহ্ তায়ালাকে ছেড়ে পড়ে আছি দুনিয়ার ধান্ধায়। সময় পার করছি নারীর পেছনে, গাড়ি বাড়ি সম্পদের পেছনে। আরে আমরা তো দুনিয়া কামাই করছি না, করছি আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জীবনের অপচয়। এ হাত, এ চোখ, কান, এ জবান, এ পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছুকে অপব্যবহার করছি আমরা।

হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে? তাহলে শুনুন, মুয়াজ্জিন যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আমাদের ডাকে। কতভাবে কত সুন্দর আওয়াজে, আমাদের আহ্বান করে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। তিনি মহান স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান।

মুয়াজ্জিন ডাকতে থাকে আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমরা শুনিনা, একদিনও না, যদি শুনতাম, তাহলে মসজিদে যাই না কেন? কাবার দিকে মুখ ফিরাই না কেন? আহ! আফসোস।

মুয়াজ্জিন বলতে থাকে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল। বলুনতো, তাহলে আমরা আজ তাকে দোজাহানের বাদশাহ, প্রিয় নবী আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব। মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি? আমরা কি একথা ভুলে গেছি যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য আমাদের মুক্তির জন্য কত কষ্ট করেছেন?

আমাদের জন্য পৃথিবীর মাটিকে নিজের বুকের রক্তে লাল করেছেন? আমরা কি জানিনা আমাদের মুক্তির জন্য পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন?

আমরা কি করে এমন মঙ্গলাকাঙ্খীর কথা ভুলে যাব? যিনি আমাদের চিরস্থায়ী মঙ্গলের জন্য দিনের পর দিন অনাহারে ছিলেন।

রাতের পর রাত কাটিয়েছেন নির্ঘুম। সিজদায় পড়ে সারারাত কাঁদতেন আল্লাহ্ দরবারে। সেতো আমাদেরই জন্য।

আমাদের কত দুর্ভাগ্য। আমরা আজ কল্যাণের পথ ছেড়ে ধ্বংসের পথে হাঁটছি। মুয়াজ্জিন ডাকছে, হাইয়ায়ালাস সালাহ, এসো নামাযে এসো। হাইয়া আলাল ফালাহ্, এসো সফলতার দিকে এসো। আমরা শুনছি না, কেয়ার করছি না। আমাদের স্পর্ধায় আকাশের জমিনের সব ফেরেশতাগণ হতবাক। আমাদের অহংকার দেখে, আমাদের বেয়াদবী দেখে স্তব্ধ আকাশ, মাটি, পাহাড়, সাগর।

আজ আমরা মসজিদ ছেড়ে কোথায় সফলতা খুঁজি? বাজারে? দোকানে? বিলাসবহুল বাংলোতে? সচিবালয়ে? কোথায়? কোথায় সে সফলতা? দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে কি আপনি পেয়ে গেলেন সফলতা? অনেকগুলো সার্টিফিকেট আর টাকার পাহাড়ে চড়েই কি মনে করছেন আপনি সফল? বলুন তো এ সফলতা কতদিনের জন্য? কত শতাব্দীর জন্য? কয় শত বছর ধরে আমি থাকতে পারবো পৃথিবীতে? না। হায়! আমরা কত অবুঝ! কত অবাধ্য বেপরোয়া। কত

বোকা! আমরা অনন্ত আনন্দময় সে জীবনের সফলতাকে গ্রহণ না করে কুড়িয়ে নিচ্ছি দুনিয়ার দু'দিনের সফলতা। যার স্বাদ গ্রহণ করতে না করতেই জীবনের চাকা থেমে যায়।

সেদিন আমার কোন বন্ধু থাকবে না নেক আমলগুলো ছাড়া। রোজ হাশরের সে অচেনা মাঠে আফসোসের সীমা থাকবে না। দুনিয়ার জীবনের কথা মনে করে কাঁদবো। আফসোস করে, বলব হায়! আমি কি করে এসেছি? কি নিয়ে মহাপরীক্ষার জন্য হাজির হয়েছি। আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজেকে বরবাদ করেছি। কি লাভ হবে সেদিন এসব চিন্তায় অনর্থক কান্নায়? এ কান্নার প্রয়োজনতো হলে দুনিয়ার জিন্দেগীতে।

আল্লাহ্ পাক তো বলেছেন, আমার হুকুমের খাঁচায় নিজেকে বন্দি করো। আর আমার হাবিবের আদর্শে তার তরীকার সোনালী শিকলে নিজেকে বাঁধ। আজ আমরা নির্বোধের মত কি করছি? শয়তানের ধোঁকায় পড়ে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে গিয়ে সর্বনাশ করছি।

আমরা আজ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আহত, রক্তাক্ত। স্বাধীনতার নামে শিরক করছি, যিনা করছি। চোঘলখুরি করছি। নামায রোজা ছেড়ে দিয়েছি। সম্পদ কমে যাবে এ ভয়ে যাকাতও দিচ্ছি না। আমরা গুনাহকে গুনাহ মনে করছি না। সুদ ঘুষকে হালাল করে নিয়েছি। চুরি, ডাকাতি খুন ধর্ষণ সবইতো আমাদের দ্বারা হচ্ছে। কোন পাপইতো আমরা ছাড়ছি না। আমরা কিভাবে কোন সাহসে আল্লাহ্ তায়ালার আযাব গজব থেকে নির্ভয় হয়ে আছি?

মনে রাখবেন, এ ধৃষ্টতার জবাব আমায় দিতে হবে। সেদিন দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। উত্তপ্ত সূর্যের নিচে। এ পাপ আমাকে সেদিন নিক্ষেপ করবে ঘাম, পুঁজ আর দূষিত রক্তের সমুদ্রে। সেদিন কাঁদবো, বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করবো। ক্ষমা চাইব আল্লাহ্ তায়ালার কাছে, কি লাভ হবে? আমার কান্না বিফলে যাবে।

হে ভাই! ও বোন! আসুন পরকালে যেন কাঁদতে না হয়, সে ব্যবস্থা করি। সময় থাকতে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসি।

সেখানে কেউ কারও কাজে আসবে না

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন!

সেখানে হাশরের মাঠের অবস্থা বড়ই করুন হবে। ভয়াবহ সে কষ্ট। ভয়, হতাশা, আতঙ্ক এমন পর্যায়ে পৌছাবে। যে মানুষের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

তখন পাপিরা সে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকমের উপায় খুঁজতে থাকবে। সে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সব দিতে চাইবে। এমনকি সারা দুনিয়ার সব কিছু দিয়েও নিজেকে বাঁচাতে চাইবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে,

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ

অপরাধীরা সেদিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততিকে। (সূরা মায়ারীজ-১১)

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

স্ত্রী ও ভ্রাতাকে। (মায়ারীজ)

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ

তার জ্ঞাতি গোষ্ঠি যারা তাকে আশ্রয় দিত। (মায়ারীজ, ১৩)
তার সকল আপনজনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। এরপর বলবে, যদি এতেও না হয় তাহলে,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

এবং পৃথিবীর সকলকে। (সূরা মায়ারীজ, ১৪)

বলবে পৃথিবীর সকলকে জাহান্নামে ফেলে হলেও আমাকে বাঁচাও আল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার সোজা জবাব,

-كَلَّا না। কখনো না, (সূরা মায়ারীজ, ১৫)

এমন ভয়াবহ দিনের কথা তো আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছিলেন। আমরা তা তার গুরুত্ব দেইনি। গুরুত্ব দিলেও সে অনুযায়ী আমল করিনি। যার কারণে আমরা পরকালের মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা জানিনা। আমরা অল্প সময় পৃথিবীতে অবস্থান করে কত কাণ্ডই না করে যাচ্ছি! সম্পদের আর টাকার অহংকারে আমাদের পা যেন মাটিতে পড়তে চায় না। পেশী বহুল দেহটা নিয়ে আমার কতই না অহংকার! সুন্দর চেহারা আর বংশ মর্যাদা নিয়ে আমরা বহুত গর্ব করি। আচ্ছা আমরা কেন ভাবিনা যে, এ সম্পদ আমার কোন কাজেই আসবে না যদি তা নেক সুরতে ব্যবহার না হয়।

আমার এ পেশিবহুল শরীরখানা কবরে রাখার পর তিনদিনেই পচে গলে পোকা-মাকড়ের খাদ্য হবে। আমার সুন্দর চেহারাটি কুৎসিত হয়ে যাবে। পোকা মাকড়ে খেয়ে ফেলবে। না চামড়া থাকবে, না গোশত। ভাবুনতো আমরা কি

নিয়ে এত গর্ব করি? কিসের এত অহংকার আমাদের? কেন এত উদ্ধত বেপরোয়া আমাদের আচরণ?

আজ আমরা এ দেহ, এ সৌন্দর্য এ সম্পদ যা পেয়েছি তা তো আল্লাহ্ তায়ালার দান। আল্লাহ্ তায়ালা আমার এ সুন্দর দেহ এক পলকের মধ্যে কুৎসিত করে দিতে পারেন। ছিনিয়ে নিতে পারেন আমার গর্বের ধন সম্পদ। আমার কি ক্ষমতা আছে এগুলোকে ধরে রাখার। যদি আল্লাহ্ তায়ালা কেড়ে নিতে চান। আমরা আজ এতটাই অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছি যে, আমাকে দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া পর্যন্ত আমরা করতে ভুলে গেছি। প্রতি পদে পদে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের না শোকরি করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য হচ্ছি।

আমাদের অবাধ্যতায় মহান আল্লাহ্ তায়ালার কি বা আসে যায়। তিনি তো সর্বশক্তিমান। তিনিতো আমাদের মুহতাজ নন। আমরাতো তাঁর গোলাম। আমরা তাঁর অবাধ্য হয়ে নিজেদেরকে বরবাদ করছি। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত আল্লাহ্ অনুগ্রহ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। আমরা কেন ভুলে যাই, কেন ভুলে যাই, আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। প্রতিটি সেকেন্ডের জবাব আমাকে দিতে হবে। দুনিয়াতে এত সুখ করছি, এত আরাম আয়েশ করছি, পরিবার স্বজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এতই মজে আছি যে, সেদিনের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারছি না। প্রস্তুতির কথা মনেই নেই। দুনিয়ার এ সুখ তো সেদিন আমায় ভোগাবে। এ পরিবার, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কাজে আসবে না। আমার খবর নেয়ার সময়ও কারও থাকবে না।

সাইয়্যিদীনা হযরত হাসান (রাযী) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযী.) এর কোলে মাথা মোবারক রেখে শুয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হালকা ঘুম এসে গিয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাযী.) এর চোখের পানি দুএক ফোঁটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারকে পড়েছিল। হালকা ঘুমে ছিলেন। উষ্ণ পানির ছোয়ায় তিনি চোখ মেলে তাকালেন। দেখেন হযরত আয়েশা (রাযী.) কাঁদছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন?

হযরত আয়েশা (রাযী.) বলেন, হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পরকালের কথা মনে পড়ছে। আচ্ছা, সে সময় আপনার কি আমাদের কথা মনে থাকবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষণ্ন মনে বলেন, সেই আল্লাহ্ তায়ালার কসম, যার হাতে আমার জীবন, মরণ। তিনটি সময় কারও কথাই মনে থাকবে না।

যখন মিযানের পাল্লায় কর্মের ওজন করা হবে।

তখন মানুষ ভয়ে অস্থির থাকবে। কি জানি কোন পাল্লা আজ ভারি হবে, পাপের না পুণ্যের? আমলনামা ডান হাতে না বাম হাতে দেয়া হবে? আর পুলসিরাত পার হওয়ার সময়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযী.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, হাশরের দিনে মানুষকে খালি পা, নগ্ন দেহে জমা করা হবে, এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল!

নারী-পুরুষ একে অপরকে এ অবস্থায় দেখবে না? তাতো বড় লজ্জার ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! সেদিন বড় কঠিন অবস্থা হবে। মানুষ ভয়ে আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় এতটাই অস্থির থাকবে যে, একে অন্যকে দেখার বুঝার অনুভব করারও আগ্রহ থাকবে না। কারণ, ভয়ানক সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

সেদিন হযরত জিব্রাঈল (আ.) ঘোষণা করবেন, অমুকের পুত্র অমুকের নেকীর ওজন কম হয়েছে, সে ব্যর্থ হয়েছে। সে আর কখনও সফল হবে না। এ ঘোষণার পর জাহান্নামের আগুন ফুসে উঠবে। এরপর পাপীদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। একজনকে আরেকজনের সাথে।

কোরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে,

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

সেদিন তুমি পাপিষ্ঠদেরকে দেখবে শিকলে বাধা অবস্থায়, একে অপরের সাথে।

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

তাদেরকে আলকাতরার (আগুনের) জামা পড়ানো হবে। তাদের মুখ আগুনে ঢেকে যাবে।

পাপীদের পোশাকও হবে আগুনের। সে জ্বলবে সে আগুনে, পুড়বে। অনন্ত কাল, মৃত্যু হবে না। আর্তনাদ করবে-কাঁদবে।

সেদিন ফয়সালা হবে আমাদের ভাগ্যের

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এ দুনিয়াতে আমরা পড়ে আছি হেয়ালীর মধ্যে। ডুবে আছি মহান আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতায়। মুখে বলছি আমরা মুসলমান। কিন্তু কাজতো করছি সব বেদ্বীনদের মতো। সব কিছুতেই বেদ্বীনদের অনুকরণ করছি। চাল-চলন উঠা-বসা, খাওয়া পোশাক পরিচ্ছেদ সব কিচছুতেই বেদ্বীনদের অনুসরণ অনুকরণ। কেন? আমরা কেন এমন করছি?

এ জমিনতো আল্লাহ্ তায়ালার! আল্লাহ্ তায়ালা একে অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেখানে যা লাগে তা দিয়ে একে সাজিয়েছেন। এ জমিন তো এজন্য সৃষ্টি করেননি। যে আমরা এখানে বেপরোয়া হয়ে চলব। এ জমিনে আমরা বেহায়া বেলেল্লাপনা করব, নাচব, গান গাইব, পাপে পাপে দুনিয়া ভরে ফেলব। এজন্য এ জমিনে আল্লাহ্ আমাদের পাঠান নি। আল্লাহ্ তায়ালার জমিন আল্লাহ্ অপবিত্র রাখবেন না। আজ আমরা এ জমিনকে পাপাচার দিয়ে ভরে ফেলেছি। আমরা কেন ভুলে যাই, আমরা যা করছি, সব আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন দেখছেন—

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوم

আল্লাহ্ ঘুমান না, তন্দ্রাচ্ছন্নও হন না।

আল্লাহ্ দেখেন যখন তুমি নারী বেপর্দা হয়ে অর্ধউলঙ্গ হয়ে বাহিরে যাও? যখন তুমি শান শওকতের সাথে নিজেকে প্রকাশ কর। যখন তুমি অহংকারের সাথে বলতে থাক। আমার এত এত সম্পদ আছে, যখন তুমি নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব কর। যখন তুমি নিজের এলেমের অহংকার কর। নিজেকে বড় ভাব, তোমার এ আচরণগুলো কি তিনি দেখছেন, অবশ্যই সব কিছু আল্লাহ্ তায়ালার নজরে আছে। আমরা ভুলে গেছি কি যে, মৃত্যু আমার কত কাছে? ভুলে গেছি কবর আমার শেষ ঠিকানা, চিরস্থায়ী ঠিকানা। আমরা কেন ভুলে যাই! এ সুন্দর আমার শরীর, যা নিয়ে আমার এত অহংকার, তা মাটির সাথে মিশে যাবে। আরে আমরা কেন ভুলে যাই যে, আমার কাফনের কাপড় বাজারে এসে গেছে। এটাও তো নির্ধারিত হয়ে আছে, যে কোন পোকা আমার গালের অংশ খাবে, কোন পোকা আমার হাত, পা পেট, চোখ, কান ঠোঁট খাবে। হায়! আমরা যদি বুঝতাম যে আমরা কবরে পোকা মাকড়ের রিযিক হয়ে গেছি। আজ এ পেশিবহুল শরীর নিয়ে আমার কতই না গর্ব। অথচ আমরা ভুলে গেছি, এ শরীর পোকার খাদ্য।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! মনে রাখবেন, কবরে শুধু আপনার আমল যাবে। এ সম্পদ, এ বাড়ি গাড়ি সমস্ত দুনিয়ার কোন কিছুই সাথে যাবে না।

হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন প্রথম তার নেক আমল এসে বাম দিকে হাজির হয়। আর বলে আমি তোমার নেক আমল। মৃত ব্যক্তি তখন বলবে, আমার স্ত্রী-সন্তানরা কোথায়? আমার আত্মীয় স্বজনরা কোথায়? আমার সম্পদগুলো কোথায়? নেক আমল তখন বলবে, ওসব কিছুই দুনিয়াতে পড়ে আছে। এখন আমিই তোমার সাথী, তোমার কবরে তোমার সাথে একা একমাত্র আমি।

আজ আমরা দুনিয়াতে রাতের আঁধারকে ভয় করি, রাতের আঁধারে বাতি নিয়ে বের হই। বিড়ালের ডাকে ভয় পাই, কুকুর দেখলে ভয়ে রাস্তা বদল করে ফেলি। সেদিনের কবরের অন্ধকারে থাকতে পারবেন কিনা ভেবে দেখুন। আলোর ব্যবস্থা করে কবরে যান। আযাবের ফেরেশতার সম্মুখীন হতে না চাইলে আমলের পাল্লা ভারি করুন। কারণ এ নেক আমলগুলোই কবরে আমাকে সঙ্গ দেবে। একাকী কবরে নেক আমলগুলোই আমার একাকিত্ব দূর করবে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন।

হাশরের আলোচনা

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে– দ্রুতগতিতে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ হচ্ছে, যখন শিংগায় ফুক দেয়া হবে আর দলে দলে মানুষ তার প্রভুর দিকে ফিরে আসবে। (সূরা ইয়াসীন)

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

তারা বলবে, হায়! কি বিপদ! আমাদেরকে ঘুম থেকে কে জাগালো? (জবাব আসবে) দয়ালু আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা করেছিলেন। আর সতর্ককারীগণ সাবধান করেছিলেন ঠিকই। (সূরা ইয়াসীন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সেদিন মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দাঁড়াবে। বিচার হবে। হয়ত মুক্তি পাবে– নয়তো হবে বন্দি। সেদিন হাজির করা হবে আমাদেরকে। তখন লুকানোর মত কিছুই আর থাকবে না। কারও আমলনামা

ডান হাতে দেয়া হবে। ডান হাতে আমলনামা পেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি আনন্দিত হবে। অন্যদেরকে বলবে, দেখ, তোমরাও এটা পড়ে দেখ। এটা আমার আমলনামা। আমি আগেই জানতাম, হিসাব আমাকে দিতেই হবে। দুনিয়াতে থেকে আজকের দিনের প্রস্তুতিটা নিয়েছিলাম বলে রক্ষা। এরপর সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি জান্নাতে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে থাকবে। সে জান্নাত হবে খুব উঁচুতে। সেখানে সব রকমের ফল নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। জান্নাতি যখন ইচ্ছা করবে তা খেতে পারবে। প্রতিটা জান্নাতি অসংখ্য অসংখ্য নিয়ামতের অধিকারী হবে।

আর যার আমলনামা বাম হাতে আসবে। সে হতভাগা বলতে থাকবে, হায়! আমার আমলনামা যদি না দেয়া হতো, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। আফসোস আমার জন্য। মরণেই যদি সব শেষ হয়ে যেত। হায়! আমার ধন-সম্পদ কোনই কাজে এলো না সব বরবাদ হয়ে গেল।

এরপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধরো একে, এর গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও। ফেলে দাও জাহান্নামে, ধাক্কা দিয়ে।

এ দিনতো সে দিন মহা পরীক্ষার দিন। কৃতকর্মের ফলাফলের দিন। মহাশাস্তির দিন। যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযী.) বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেন। হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল! সে দিনটি কত বড় হবে?

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সে আল্লাহ্ তায়ালার কসম করে বলছি, সে দিনটি মুমিন বা বিশ্বাসী বান্দার জন্য একটা ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।

আর নাফরমানদের কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো দীর্ঘ মনে হবে। কারণ, এখান থেকেই তাদের অবাধ্যতার শাস্তি শুরু। তখন তারা টের পাবে, তাদের অবাধ্যতা আর ধৃষ্টতা কত নিকৃষ্ট ছিল।

পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সূর্য তাপে। মাথার এক বিঘত বা একটু বেশি দূরে নেমে আসবে সূর্য। তার আলো থাকবে না। শুধু তাপ থাকবে। অসহ্য যন্ত্রণাময় সে শাস্তি। একটু নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকবে না। ঘেমে নেয়ে যাবে। চোখের পানি ঝরতে থাকবে। তাতে ডুবে যাবে টাখনু। এরপর কোমর, এরপর গলা। ঝরবে অনুতাপের অশ্রু, কিন্তু কি লাভ হবে? এ অনুতাপ যদি দুনিয়াতে করত। যদি সে অনুতাপের আর ভয়ের অশ্রু এক ফোটাও গড়িয়ে পড়ত তোমার চোখ থেকে, তাহলে সে পানিতে নিভে যেত জাহান্নামের আগুন।

সেদিন অনুতাপ করতে করতে চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। এরপর চোখ দিয়ে ঝরবে রক্ত। রক্তের নদী বয়ে যাবে। সে রক্ত নদীতে সাতার কাটবে। ডুবে যাবে। আবার উঠবে। প্রচণ্ড গরম পানির নদীতে ফেলে দেয়া হবে, শরীর জলে পুড়ে খসে পড়বে। অথচ এ শরীরের কত যত্ন করি আমরা। কত অমূল্য শরীর আমাদের। এ শরীরের জন্য হালাল হারাম বাছবিচার করি না। চুরি করি, মিথ্যা বলি, সুদ-ঘুষ বাদ দেই না এ শরীরের আরামের জন্য।

নিজেকে বড় করার জন্য অন্যকে ছোট করি। গীবত করি। ঘুষের টাকায় আমাদের কত বিলাসিতা। ঘুষের কাড়ি কাড়ি টাকা কামাই করে আমাদের আজ কত অহংকার।

আল্লাহ্ পাক সেইদিন যখন জিজ্ঞেস করবেন, হে বান্দা! আমার দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার করতে। দুনিয়াতে তো তুমি বড় বড় সর্দার মাতবর উজির নাজির নিয়ে দম্ভ করে চলতে। যা ইচ্ছা তাই করতে।

দুনিয়াতে কত দুঃসাহস দেখিয়েছো। আমার আদেশ নিষেধ অমান্য করেছো। আমাকে ছেড়ে আমার সৃষ্টির পূজা করতে, সিজদা করতে, মূর্তির কাছে চাইতে। অথচ তা তোমার নিজ হাতে বানানো ছিল। তোমরা অবিশ্বাসী। তোমরা আমাকে মাননি।

আর যারা ঈমান এনেছিল, কিন্তু শিরক করতো। তাদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দা! কি করলে তুমি দুনিয়ার মহা মূল্যবান জীবনে? তোমরা ঈমানদার হয়েও আমার অকৃতজ্ঞতা করেছো। আমাকে সিজদা না করে কবরে সিজদা করেছো। পীরকে সিজদা করেছো। মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে ধন-সম্পদ, সন্তান, সুখ-শান্তি চেয়েছো। অথচ তার কোন ক্ষমতা ছিল না। সে নিজেই ছিল অসহায়। আমার করুণা প্রার্থী।

বান্দা! তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আমাকে ডাকনি। আমার সামনে মাথা নত করনি। তোমার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকতাম, আমার বড় আকাঙ্খা ছিল তুমি আমার হবে। আমার কাছেই মাথা নত করবে। আমার জিকির করবে। আমাকেই শুধু ডাকবে সমস্ত বিপদ আপদে। সুখে-দুঃখে। চাইবে আমার কাছে। আমি চেয়েছিলাম বান্দা তুমি আমার হবে। যদি তুমি আমার হতে, আমিও তোমার হয়ে যেতাম।

বান্দা! তুমি একি করলে? আমার সামনে আমার অবাধ্য হয়ে কেন এলে? কেন আমার অনুগত বান্দা হয়ে আমার কাছে এলে না?

তোমাদের সংশোধনের জন্য যুগে কত নবী পাঠিয়েছি। কত রাসূল পাঠিয়েছি। কত দাই, মুবাল্লিগ, আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির পীর বুযুর্গ ছিল। তারাতো তোমাদের কাছে আমার আদেশ নিষেধগুলো বলেছিল। আমার পথে ডেকেছিল তোমাদের। তোমরা এলে না, বুঝলে না তাদের কথা। শুনলে না কারও কথা। অবহেলা করলে, ঠাট্টা করলে। অস্বীকার করলে। অথচ তাদের কাছে ছিল প্রকাশ্য প্রমাণ। অকাট্য দলিল। সে পথ ছিল সাফল্যের, কল্যাণের।

সেদিন কি জবাব দেব? আল্লাহ্ যখন জিজ্ঞেস করবেন, হে বান্দা! কি কারণে পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলে? যে পিতা সারাদিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার খাবার জোগাড় করতো। তোমার সুখ-শান্তির জন্য সব আবদার পূরণ করতো। আজ সে পিতার সাথে কি কারণে খারাপ ব্যবহার করলে? কিভাবে করলে?

আর তোমার মায়ের কথা কি তুমি ভুলে গেছো? কেন? যে মা তোমাকে পেটে ধরেছে দশ মাস দশদিন, কত কষ্টের পর সে দিনগুলো, রাতগুলো, প্রতিটা ঘন্টা মিনিট কাটতো অসহ্য যন্ত্রণায়। তার পরও তোমার মার মনে সুখ ছিল। তোমার সুন্দর মুখখানা দেখার আশায় দিনগুলো পার করে তোমাকে জন্ম দিয়েছে। সে তুমি বড় হয়ে ভুলে গেলে মাকে! বৃদ্ধ বয়সে তাকে কত রকমে কষ্ট দিয়েছ?

হে বান্দা! এত পাপ করে এসেছো, তওবাও তো করনি। তওবা করলে আমি মাফ করে দিতাম। আমি অপেক্ষায় ছিলাম তোমার তওবার। তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। তওবা করবে। তুমি এমনই হতভাগা, যে সে সুযোগটাও নিলে না।

আজ তো সবই দেখতে পাচ্ছো। এ হাশরের মাঠে আজ ফয়সালা হবে, সব কর্মের হিসাব দিতে হবে পাই পাই। এখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সর্বত্র আমার রাজত্ব। আমার সীমানা। আমার নিয়ন্ত্রণে সব কিছু। সব কিছু আমার দৃষ্টির মধ্যে।

দুনিয়ার জিন্দেগী

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযী.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى

عَلٰى مَا يَفْنٰى

যে দুনিয়াকে ভালবাসে সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখিরাতকে ভালবাসবে, সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তোমরা চিরস্থায়ীকে ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য দাও।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাযী.) বলেন, আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযী.) এর সাথে ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। তার সামনে মধু ও পানি পেশ করা হলো। পান করার জন্য তা হাতে নিয়েই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তার কান্না দেখে সঙ্গীরাও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কাঁদার পর তার সঙ্গীরা কান্না বন্ধ করেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযী.) তখনও কাঁদতে ছিলেন। তার কান্নায় চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল। এক সময় হযরত আবু বকর (রাযী.) কান্না থামিয়ে চোখের পানি মুছলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেঁদেছেন কেন? হযরত আবু বকর (রাযী.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে ছিলাম, দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যেন অপসারণ করছেন। অথচ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি সরাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তা ছিল দুনিয়া। আমার সামনে হাজির হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আমার সামনে থেকে সরে যাও। সরে গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বলতে থাকে, আপনি যদিও আমার থেকে দূরে থাকছেন, আপনার পরবর্তীরা কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে না। তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান রাব্বুল আলামীন এর যিনি গর্দান ভেঙ্গে দিয়েছেন বড় বড় জালিম ও মন্দ লোকদের এবং উঁচু উঁচু অট্টালিকার মালিকদের বিলাসবহুল কামরাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর বড় বড় সম্পদওয়ালাদের সব আশা ভরসা মৃত্যুর মাধ্যমে থামিয়ে দিয়েছেন। এ লোকগুলো তো এমন ছিল, যে মৃত্যুর কথা শুনতেই চাইতো না। মজা করত, বিদ্রূপ করতো। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার সত্য ওয়াদা মৃত্যু তাদের গ্রাস করল। আর বিলাশ বহুল অট্টালিকা থেকে মাটির নিচে ফেলে দিয়েছেন এবং রং বেরংয়ের বাতির আলো থেকে, নরম বিছানা থেকে অন্ধকার কবরে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামী দুনিয়ার জিন্দেগী পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন। এ দুনিয়ায় যার আগমন হয়েছে, তাকে একে ছেড়ে যেতেই হবে। এখানে চিরস্থায়ী

কেউ নয়। চাই সে বাদশাহ হোক, চাই সে ফকির হোক, মৃত্যু সবার শেষ পরিণতি।

হযরত ঈসা (আ.) কে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন। হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! আপনি নিজের জন্য ঘর তৈরি করেন না কেন? হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আমার পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের পুরনো ঘরগুলোই আমার জন্য যথেষ্ট।

আজ আমাদের জন্য আফসোস! যে আমরা সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরিতে মগ্ন। আমরা পড়ে আছি সুন্দর বাড়ির পেছনে, নারীর পেছনে, সম্পদের পেছনে। যা দ্বীন থেকে দূরে থাকা ও মৃত্যু থেকে বেখবর হওয়ার প্রমাণ।

তাই বুদ্ধিমানদের জন্য পরকালের জিন্দেগীর প্রতি নজর দেয়া উচিত। তার জন্য তৈরি হওয়া উচিত। কারণ আমরা দুনিয়ার মোহে এতই মগ্ন হয়ে আছি যে, কারও মৃত্যু দেখেও আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় না। আমরা ভুলে যাই মৃত্যু সবার জন্য। যে কোন সময় আমার জিন্দেগীর খেল তামাশা খতম হয়ে যেতে পারে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের দেখে বিস্ময় লাগে যে, কিভাবে তারা ধোঁকার আবাস দুনিয়ার জন্য মেহনত করে চলেছে।

বর্ণিত আছে, একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আবর্জনার স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, দুনিয়াদার দুনিয়ার দিকে আস। এ বলে তিনি ময়লার স্তুপের ভেতর হাত প্রবেশ করিয়ে একটি পচা অংশ তুলে আনলেন। যাতে পুরনো হাড্ডিসমূহ ছিল। এরপর বলেন, এ হলো দুনিয়া। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ার যত রঙ রূপ আছে তা অচিরেই পচন ধরবে। পঁচা আবর্জনার খণ্ডের মত। এ সুন্দর শরীর অচিরেই হাড্ডি আর হাড্ডিতে পরিণত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযী.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবু হুরায়রা! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব দেখিয়ে দেব? আবু হুরায়রা (রাযী.) বলেন, জ্বি-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর আমার হাত ধরে মদীনার এক উপত্যকায় নিয়ে যান, যেখানে আবর্জনার একটা স্তুপ পড়েছিল। তা ছি মাথার খুলি, পঁচা গলা পুরনো বস্ত্র ও কঙ্কালের স্তুপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আবু হুরায়রা! এ মাথার খুলিগুলোতেও তোমাদের মত কত লালসা, কত রকমের

আশা পোষণ করতো। আজ দেখ, তা হাড্ডিসার হয়ে পড়ে আছে, তাদের চামড়াগুলো মাটি হয়ে গেছে। এ যে ময়লার স্তূপ দেখছো, এ হলো তাদের পেটের খাদ্যসমূহ। যা তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে উপার্জন করেছিলো এবং পেটে ভরেছিলো। কিন্তু পেট সেগুলো বাইরে ঠেলে দিয়েছে। আজ মানুষ তাদের দেখে ঘৃণা করে। আর এ জীর্ণ কাপড়গুলো হচ্ছে তাদের পোশাক, যা তাদের শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো। আজ তা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সে কঙ্কাল, যার উপর ভর করে কত শহর বন্দর চষে বেড়িয়েছিলো। দুনিয়ার এ পরিণতির জন্য কারও যদি কাঁদতে ইচ্ছা হয়, তাহলে এ করুণ দশা দেখে সত্যি কাঁদা উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাযী.) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা শুনে আমাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল।

হযরত লোকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আখিরাতের স্বার্থে তুমি দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও। তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিতেই তুমি লাভবান হবে। কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে আখিরাতকে বিক্রি করো না, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরত আনাস (রাযী.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يُمَحِّصُ الذُّنُوْبَ وَيُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا

তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। কেননা মৃত্যুর চিন্তা পাপকে বিলুপ্ত করে দেয়, দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) বলেছেন, রাব্বুল আলামীন দুনিয়াকে তিন ভাগ করেছেন, এক ভাগ মুমিনের জন্য, একভাগ মুনাফিকের জন্য, একভাগ কাফেরের জন্য। তাই মুমিন নিজের পরকালের পুঁজি সংগ্রহে ব্যস্ত। মুনাফিক বিলাস সামগ্রীর অন্বেষণে ব্যস্ত। আর কাফের ভোগে ব্যস্ত।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার কসম, বনী ইসরাইলীরা যে মূর্তি পুজায় লিপ্ত হয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মুহাব্বত।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করে আমাদের কবুল করুন। আমীন।

কণ্ঠশিল্পী জুনায়েদ জামশেদের ঘটনা

জুনায়েদ জামশেদ, পাকিস্তানের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী। গায়ক হিসেবে দেশ বিদেশে তার খ্যাতি তুঙ্গে ছিল। তার কণ্ঠের গান শুনতে শ্রোতারা মুখিয়ে থাকত। গান গেয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে সাথে কামিয়েছিলেন অঢেল টাকা। বাড়ি গাড়ি ছিল, বিলাসবহুল জীবন ছিল। ১৯৯৭ সালের কথা। জুনায়েদ জামশেদ এলো আমার কাছে। বলে, জীবনের বৃত্তান্ত। বলে, একজন যুবক যতসব সুখ আনন্দ ও স্বাদ আহ্লাদের প্রত্যাশা রাখে, আমার জীবনে তার সবই অর্জিত হয়েছে কোন স্বপ্নই আমার অপূর্ণ থাকেনি। যখন যা চেয়েছি, তাই আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি এমন এক নৌকা যার কোন গন্তব্য নেই।

জুনায়েদ জামশেদের ঘটনা আসুন আমরা তার মুখ থেকেই জেনে নেই।

বলেছেন জুনায়েদ জামশেদ। একদিন এসি গাড়িতে চড়ে বাসায় ফিরছিলাম। সে সময়টা ছিল মধ্য দুপুর। পাকিস্তানে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। প্রচণ্ড রোদ্রের তাপ, রাস্তায় মানুষ নেই বললেই চলে। প্রচণ্ড গরমের কারণে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। সে সময় আমি দেখলাম কিছু লোক গাট্রি কাধে নিয়ে এ রোদ্রের মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন মনে হলো। হতবাকও হলাম। মনে মনে বলছি এ লোকগুলো কি পাগল? পাগল না হলে কি কেউ এভাবে এমন গরমের মধ্যে চলাফেরা করে? যেখানে আমি এসি গাড়িতে বসেও ঘামছি। কি মনে করে গাড়ি থামিয়ে তাদের কাছে গেলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনারা এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কোথায় যাচ্ছেন? কেনই বা যাচ্ছেন? যাকে জিজ্ঞেস করলাম সে সবার পেছনে ছিল। তাই ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করেনি। সে বলে, ভাই আমরা তাবলীগ জামাতের লোক। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা পূর্বেও ছিল, তাই বুঝতে অসুবিধা হলো না ব্যাপারটা। এরপর আমি চলে এলাম। এরপর জামাতের লোকগুলো যখন মসজিদে পৌঁছল, তখন, যার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। সে অন্যান্য সাথীদেরকে বলে, আজ শিল্পী জুনায়েদ জামশেদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। জামাতের সাথীরা আশ্চর্য হয়ে গেল। বলে, তাই নাকি? এরপর আমীর সাহেব ঘটনাটি শুনে বলেন, তাই নাকি, সে আর আমিতো এক ক্লাসেই পড়েছি।

এরপর আমীর সাহেব, কিভাবে যেন আমার নাম্বারটা সংগ্রহ করে আমাকে ফোন করেন, দাওয়াত দিতে লাগলেন। একদিন দুদিন নয় বহুদিন। একদিন সে আমার বাড়িতে উপস্থিত। তাকে দেখেতো আমি হতবাক! তাকে জিজ্ঞেস

করলাম কি মনে করে আসা হলো ভাই? সে বলে, দেখা করতে আসলাম। এরপর সে আমাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করল। আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম, আমার ভাল লাগছিল না এ সব কথা শুনতে। আমি শুনতে চাইতাম না। তাকে বিদায় করে দিতাম। বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম। পরের দিন আবার আসতেন। আবার বলতেন, ভাই ফিরে এসো দ্বীনের পথে। সে পাগড়ি খুলে আমার পায়ে রেখে দিত। বলতো ভাই আমাকে ফিরিয়ে দিও না। সে নেক দিল মানুষটির ধৈর্য্য ও ত্যাগ দেখে আমার আশ্চর্য লাগে। এ লোকটিকে আমি অপমান করছি, সে কিছুই মনে করছে না! এক দু'দিন নয়, তিনটি বছর সে আমার পিছে মেহনত করল। অবশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার মেহনতের পুরস্কার তাকে দেন। আসলে পুরস্কার তো তার নয়, তার উসিলায় আমাকে কবুল করেন।

এক সময় আমার মন কিছুটা নরম হলো। তার কথায় তিন দিন সময় লাগানোর ইচ্ছা করলাম। তিনদিন সময় লাগানোর পর আমার মনে হলো আমি নতুন জীবন পেয়েছি। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এত শান্তি, এত আরাম, যা আগে কোনদিন আমি পাইনি। সে দিনগুলোর পর থেকে আমি জুড়ে গেলাম আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায়। গান গাওয়া ছেড়ে দিলাম।

এর মধ্যে একদিন, তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাফরুল্লাহ খান জামালী আমাকে ফোন দেন, বলেন, জুনায়েদ! স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান জাতীয় টেলিভিশনে তোমাকে গান গাইতে হবে। আমি তাকে বিনয়ের সাথে বললাম, স্যার! আমিতো গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট হতবাক হলেন, বলেন, কি বলছ। গান ছেড়ে দিয়েছো? আমি বললাম, জ্বি স্যার। আমি গান বাজনা ছেড়ে দিয়েছি। একথা শুনে তিনি বলেন, দেখ, স্বাধীনতা দিবসে একটি দেশাত্মবোধক গান তোমাকে গাইতেই হবে। অনুরোধের স্বরে তিনি বলেন। আমি বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এ শেষ একটি গানই আমি করব। তবে আমার শর্ত হলো, গান শেষে আমি এটা ঘোষণা করে দেব যে আমি এখন থেকে আর কোনদিন গান-বাজনা করব না। তিনি বলেন, ঠিক আছে।

এরপর সে গান গেয়ে আমি এ জগত ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিলাম।

এরপর সময় চলছে। আমি আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত। গান ছেড়ে দেয়ার পর আমার উপার্জনও বন্ধ হয়ে গেল। জমানো টাকা খরচ করে দিন কাটছিল। একসময় অর্থের অভাবে বাড়ি গাড়ি বিক্রি করে দিলাম। এক সময় তাও শেষ হয়ে গেল। সন্তানরা নামি দামি স্কুলে পড়ত। অর্থের অভাবে তাদেরকে সেসব স্কুল থেকে নিয়ে আসলাম। আমি তখন চরম অর্থ

সংকটে। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে যেতাম। কি করব কিভাবে চলব? এরই মধ্যে তারিক জামিল সাহেবের সাথে পরিচয় হয়েছিল। আমার চরম হতাশাজনক অবস্থায় আমি তার কাছে গেলাম। বললাম, আর্থিক সংকটের কথা। হতাশার কথা। তিনি শান্ত্বনা দেন। হতাশ না হয়ে ধৈর্য্যধারণ করার কথা বলেন। এদিকে আমি একদিন আমার স্ত্রীকে একশত টাকা দিয়ে বললাম, আমার শেষ সম্বল হলো এ একশত টাকা। এ দিয়ে কিভাবে চলবে তা আমি জানিনা।

স্ত্রী আমাকে বলে, দেখুন, আপনি হতাশ হবেন না। এতদিন যে আল্লাহ্ আমাদের চালিয়েছেন, তিনিই আমাদের এখনও চালাবেন। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় মেহনত করছেন। আমার অন্তরে আগের চেয়ে অনেক শান্তি বিরাজ করছে। রিযিক দেয়ার মালিক আল্লাহ্, আল্লাহ্ই আমাদের দেখবেন। স্ত্রীর কথায় এবং মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের কথায় মনটা শান্ত হলো।

এরপর রুজি রোজগারের জন্যই বলতে পারেন, এক দর্জি দোকানে কাজ নিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ইনকামও হবে, কাজটা শেখাও হবে।

যাক আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী। দর্জির কাজ শিখে আমি নিজেই একটি দোকান দিলাম। মহান রাব্বুল আলামীন এ অধমের প্রতি মেহেরবানী না করলে রহমত বরকত না দিলে কিছুই সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে শোকুর গুজারী করে শেষ করতে পারব না। আজ এ একটি দোকান থেকে অনেক শাখা পাকিস্তানে গড়ে উঠেছে। তার সংখ্যা আমার নিজেরও জানা নেই। সুবহানাল্লাহ।

জুনায়েদ জামশেদ আমার কাছে এলো হতাশা নিয়ে। বলেন জীবনে সব অর্জনই তো আমার অর্জিত হয়েছে। কোন স্বপ্নই আমার অপূর্ণ থাকেনি। যখন যা চাই, তাই আমি পেয়ে যাই। কিন্তু আমার ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি এমন এক নৌকা, যার কোন গন্তব্য নেই, আমি এমন এক জাহাজ, যার কোন ঘাট নেই। বলুন তো মাওলানা সাহেব, কেন এমনটি হলো? আমি বললাম, ভাইজান, এ যে হৃদয়ের কথা বলেন, এর দরজায় আল্লাহ্ পাক পাহারা বসিয়ে রেখেছেন। এ হৃদয়টা আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া আমানত। এটি সংরক্ষিত স্থান। এখানে একমাত্র স্থান পাবে মহান রবের শোকুর গুজারী। মহান রবের জিকির মহান রবের ধ্যান। এ হৃদয় পাগল থাকবে মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে। এখানে না কোন নারী প্রবেশ করতে পারে, না কোন অশ্লীলতা? না গান বাজনা, না হারাম কোন কিছু? না দুনিয়ার লোভ লালসা, না ধন-সম্পদের মোহাব্বত?

হৃদয়ের কান ধন দৌলত, নারী, বাড়ি, গাড়ির ঝনঝনানী শোনার জন্য নয়।

হৃদয়ের চোখ দুনিয়ার বিত্ত বৈভবের চমক দেখার জন্য নয়।

হৃদয় থাকবে এসব বেহুদা বাজে বস্তু থেকে মুক্ত।

এ হৃদয়ের প্রয়োজন শুধু আল্লাহ্। যেদিন মহান আল্লাহ্ এ হৃদয়ে প্রবেশ করবে, সেদিন তোমার কুলহীন নৌকা কুলের সন্ধান পাবে। সেদিন তোমার জাহাজ ঘাটের সন্ধান পাবে।

সেদিন তোমার ভিতরটা আলোকিত হয়ে যাবে। সেদিন তোমার জীবন খুঁজে পাবে গন্তব্য।

আজকালের যুবক যুবতীরা মনে করে, বোধ হয়, গান বাজনা, নাচ মিউজিকে, ইন্টারনেটে শান্তি পাওয়া যাবে। সম্ভবত অর্থবিত্ত দিতে পারবে সুখের সন্ধান।

না, এগুলোতে সুখ নেই। সুখের কোন ছোয়াও এতে নেই। এসব হলো মরীচিকা, প্রতারণা, ধোঁকা, পাপের আড্ডা খানা। আমি বললাম, ভাই! তুমি যেখানে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছো, সেখানে সুখ পাওয়া যায় না। এ সওদা সেখানে মিলে না। সেখানে এর সওদা পাওয়া যায়, তুমি সেখানে যাও না। ব্যথার স্থানে ঔষধ না লাগালে ব্যথা সারবে না। ব্যথার স্থানে ঔষধ দিতে হবে।

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল। এরই মাঝে বদলে গেছে জুনায়েদ জামশেদ। আল্লাহ্ তাকে দৃঢ়তা দান করেছেন। জুনায়েদ ভাই দাড়ি রেখেছেন, মাথায় আমার থেকেও বড় পাগড়ি। টিভির পর্দায় স্টেজে মানুষ তাকে নাচতে গাইতে দেখেছে। কিন্তু আমি তাকে গভীর রাতে শিশুর মত অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। সে কাঁদছে, আর বলছে, হে আল্লাহ্! আমি একি করলাম!

আমি কত মানুষকে গোমরাহ করলাম! তার কান্না দেখে আমিও কেঁদেছি।

জুনায়েদ জামশেদ একবার আমার সঙ্গে ছিল। তাকে একস্থানে বয়ানের জন্য পাঠানো হলো, সে স্থানেই একসময় গান গেয়ে সে শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিল। আজ তার মুখে দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ি। গায়ে জুব্বা নিয়ে ওখানকার মানুষদের দ্বীনের কথা শোনাতে গেল।

জুনায়েদ ভাই বলেছেন, কেউ কেউ বলে, যে গান বাজনা আত্মার খোরাক। যদি তাই হতো, তাহলে আমি কখনও তা ছাড়তাম না। গান-বাজনা আত্মার খোরাক নয়। গান-বাজনা আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। গান-বাজনা শয়তানের যাদু। শয়তান এর দ্বারা মানুষকে জাদু করে অশ্লীলতার আগুনে নিক্ষেপ করে। গান-বাজনা মানুষকে অশ্লীলতার কুপে টেনে নিয়ে নগ্ন করে ফেলে। নির্লজ্জ করে ফেলে। এরপর নগ্নতা আর উলঙ্গপনাই তাদের কাছে সভ্যতার মানদণ্ড হয়ে যায়। নির্লজ্জতা বেহায়াপনা আর উলঙ্গপনা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

সাঈদ আনোয়ারের ঘটনা

সাইদ আনোয়ার পাকিস্তানি ক্রিকেটার। বিশ্ব বিখ্যাত ক্রিকেটার। খেলোয়াড়ি জীবনের অর্জন ছিল ব্যাপক। বিশ্ব সেরাদের একজন ছিলেন। কামিয়েছেন প্রচুর টাকা। আনন্দ ফুর্তিতেই জীবন চলছিল স্ত্রী সন্তান নিয়ে। কিন্তু সব হাসি আনন্দের মাঝে ছেদ পড়ল একটি হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায়। মারা যায় তার আদরের মেয়েটি। কতই বা বয়স হয়েছিল, ছয় সাত বছর। পিতামাতার সমস্ত হাসি আনন্দের কেন্দ্রে থাকা মেয়েটি মারা গেল। মেয়ের মৃত্যুর পর পাহাড়সম কষ্ট বুকে নিয়ে সাইদ আনোয়ারের দিন কাটছিল। সব আরাম আয়েশের মাঝেও পেরেশানীতে রাতে ঘুমাতে পারতো না। রাতের পর রাত কেটে যায় নির্ঘুম। কি করবেন ভেবে পান না। কোথায় গেলে, কিভাবে মুক্ত হাওয়া যাবে এ পেরেশানী থেকে?

একদিন এলেন আমার কাছে। সন্তান হারা এক পিতার হতাশাগ্রস্ত চেহারা দেখে আমারও কষ্ট লাগল। শান্ত্বনা দিলাম।

সাইদ আনোয়ার বলেন, মাওলানা! এ পেরেশানী আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। বলে দিন কিভাবে এ পেরেশানী মুক্ত হবো?

বললাম, ভাই! দ্বীনের পথে পূর্ণাঙ্গভাবে জড়িয়ে যান, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার পেরেশানী দূর করে দেবেন। এই যে আমরা বাড়ি-ঘর স্বজন ছেড়ে আল্লাহ্ তায়ালার ঘর মসজিদে পড়ে আছি, আল্লাহ্ তায়ালার পথে মানুষকে ডাকছি, আপনিও আমাদের সাথে জুড়ে গেলেন।

আরও কিছু কথা বললাম, আল্লাহ্ তায়ালার হেকমত কি জিনিস বুঝালাম। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য যে পরীক্ষা আসে, তার ব্যাপারে বললাম। জ্ঞানী, শিক্ষিত মানুষ, বুঝলেন। আমাদের সাথে মসজিদে থাকতে রাজি হয়ে যান।

সকালে আমাকে বলেন, মাওলানা! গত রাতটি আমার জীবনের সবচেয়ে আরামদায়ক রাত ছিল। আমার জীবনে এত আরামে আর ঘুমাইনি। পৃথিবীর কত বড় বড় হোটেলে ঘুমিয়েছি। এসি রুমে ঘুমিয়েছি, কোথাও এত শান্তি পাইনি। আজ আল্লাহ্ তায়ালার ঘর মসজিদে ঘুমিয়ে যে শান্তি পেলাম।

এরপর থেকে পাল্টে গেছেন সাইদ আনোয়ার। মুখে দাঁড়ি গায়ে জুব্বা, মাথায় টুপি। এখন তিনি দ্বীনি দাওয়াত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর পথে পথে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কবুল করেছেন দ্বীনের পথে। তার উসিলায় এখন অনেক মানুষ এ পথে সময় লাগাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় কবুল করুন, আমীন।

আসুন, বদলে যাই

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আসুন জীবনের গতি বদলাই। এটা আমাকেই বদলাতে হবে। নিজে নিজে বদলাবে না। আসুন আমরা তওবার দ্বারা জীবনকে বদলাই। আমরা আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বের হয়ে জীবনকে বদলাতে পারি। আর তাবলীগ হলো জীবনের গতি বদলানোর মেহনত।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাসূল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সমস্ত ইজ্জত, শরাফত, ওসমস্ত যোগ্যতার সমাপ্তি ঘটে গেছে। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নবুওয়াত, রেসালাত সমাপ্ত করে দিয়েছেন। কাজেই, এ উম্মতের উপর, কালেমা পড়নেওয়ালা সমস্ত পুরুষ মহিলার উপর আল্লাহ্ তায়ালার বাণী প্রচারের দায়িত্ব পড়েছে।

আমরা আপনাদের সামনে মন পাগল করা বয়ান করার জন্য আসিনি। আমাদের বয়ান শুনে আপনারা মারহাবা দেবেন, আপনাদের এ মারহাবা আমাদের কবরে কোন উপকারে আসবে না। আপনারা যদি আমাদেরকে কাঁধের উপর তুলে নেন, বা পায়ের তলায় পিষ্ট করেন, তাতে না আমাদের কবরে, হাশরে কোন লাভ হবে, না ক্ষতি হবে? আল্লাহ্ তায়ালার মহান দরবারে আমাদের আমল আমাদের জয়ী করবে। আমরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে আল্লাহ্ তায়ালার পথে আপনাদেরকে আহ্বান করি। দু'হাত জোড় করে বলছি, পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যাবেন না। সম্পদ আর নারীর পাল্লায় পড়ে আখিরাতকে ভুলে যাবেন না। পোশাক আর সৌন্দর্যের ধান্ধা করতে করতে মরবেন না। খতমে নবুওয়াতকে স্মরণ করুন যে, আমাদের নবী শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। তার পয়গামকে বিশ্বময় পৌছে দেয়া আমাদের নারী পুরুষ সকলের দায়িত্ব।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে বিরাট এক ত্যাগের বিনিময়ে। পিতা মাতা সন্তানকে ইসলামের জন্য কুরবান করে দিতেন। স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে, ইসলামের জন্য কোরবান করে দিতেন।

সকল সম্পর্ক সকল ভালবাসা পরিত্যাগ করে একদল মানুষ ইসলামের বাণী আমাদের পর্যন্ত পৌছানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালার পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কাফেলার পর কাফেলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে

নব্বই হিজরীতে। বিশ্বাস না হয় ইতিহাস দেখুন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাফেলার বীর মুজাহিদদের কবর আজও আছে।

এরাও তো কোন মায়ের আদরের দুলাল ছিলেন।

এরাওতো কোন নারীর ভালবাসার বাঁধন ছিড়ে এসেছিলেন।

এরাওতো কারও না কারও অবলম্বন ছিলেন।

এরাওতো কারও না কারও চোখের শীতলতা ছিলেন।

এ কাফেলার সবাই ছিল যুবক। এখন তারা মূলতানের মাটিতে শুয়ে আছেন।

বলুন তো কোন বিষয়টি তাদের সুদূর আরব থেকে ভারতের মাটিতে টেনে এনেছিল?

টাকা?

সম্পদ?

এ অঞ্চলের সৌন্দর্য?

না- এখানে কোন সম্পদের লোভে তারা আসেনি। তারা এসেছিল আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন কায়েমের জন্য। তাদের মনে এ বুঝ এসেছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তার পয়গাম আমাদেরকেই সমগ্র জগতময় ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আজ আমরা রুটি, রুজি, কাপড়-গয়না, গাড়ি বাড়ির জন্য বিক্রি হয়ে যাই। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালাকেও ভুলে যাই।

আরে ভাই! বিক্রি যদি হতে হয়, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের জন্য বিক্রি হন। যেখানে উপযুক্ত মূল্য পাবেন। কিন্তু আজ আমরা এমন এক জগতের জন্য বিক্রি হচ্ছি যে, চোখ দুটি বন্ধ হওয়া মাত্র সব শেষ হয়ে যাবে। কবরে যাওয়া মাত্র আমি বুঝব যে, আমি কত কম মূল্যে, অথবা মূল্যহীনভাবে জীবন কাটিয়েছি।

আজ আমরা নবীওয়ালা পথ হারিয়ে ফেলেছি। কত পবিত্র ছিল সে জীবন। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শময় সে জীবন থেকে আমরা দূরে সরে গেছি।

আর আমরা তার উম্মত হয়ে এমন সব কাজ করছি যে, আমাদের দেখে শয়তানও কাঁদে। নবীজীর লজ্জাশীলতা দেখে ফেরেশতাগণও লজ্জিত হতো। আর আজ আমাদের নারীদের লজ্জাহীনতা দেখে শয়তানেরও কান্না আসে।

জালেমরা, সাবধান!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

জুলুম কিয়ামতের দিবসে বহু শাস্তি ও অন্ধকারের কারণ হবে। আরেক হাদীসে আছে,

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنْ اَرْضٍ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ যমিনও জুলুম করে দখল করে নিবে, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বোঝা বেড়িরূপে পরিয়ে দেবেন।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক বলেন, অত্যাচারী ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ খুবই কঠিন ও মারাত্মক হবে। সে এমন ব্যক্তির উপর জুলুম করল, যে আমাকে ছাড়া অপর কাউকে সাহায্যকারী রূপে পায়নি।

এক বুযুর্গ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, তুমি যখন ক্ষমতার আসনে সমাসীন থাকো, তখন কারও উপর জুলুম করো না। কেননা জুলুমের পরিণাম নিশ্চিত অনুশোচনা ও লজ্জা। তুমি কারও উপর জুলুম করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকলেও মজলুম কিন্তু নির্ঘুম রাতে তোমার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করছে। আর অনন্ত জাগ্রত মহান রাব্বুল আলামীন তা শুনছেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর কিতাবে বহু জায়গায় জুলুমের ব্যাপারে বলা আছে।

এক বুযুর্গ বলেন, তোমরা কমজোর দুর্বলদের উপর জুলুম করো না। এতে তোমরা সবল হয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেন, তখন তারা মাথা তুলে আল্লাহ্ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করল, হে মহান সৃষ্টিকর্তা! আপনি কার সাথে আছেন? আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি মজলুমের সাথে আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাপ্য আদায় না করা হয়।

মজলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পৌছে যায়।

হযরত ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, এক অত্যাচারী বাদশাহ একটি অতি মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। একজন দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা এর

পাশেই ক্ষুদ্র একটি ঘর বানিয়ে সেটিতে বসবাস করতে থাকে। সে অত্যাচারী বাদশাহ একদিন ঘোড়ায় চড়ে জাঁকজমকের সাথে তার প্রাসাদ দেখতে এলো। তার প্রাসাদের পাশে বৃদ্ধার এ জীর্ণ বাড়িটি নজরে পড়ল। বাদশাহতো রেগে আগুন। জিজ্ঞেস করল, এ পাখির বাসার মত ছোট্ট ঘরটি কার? বাদশাহকে জানানো হলো, যে এটি এক দরিদ্র বৃদ্ধার। বাদশাহ বলে, এ ভাঙ্গাচূড়া ঘরটি আমার প্রাসাদের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। এটা ভেঙ্গে ফেলো। এরপর বৃদ্ধার ঘরটি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো।

বৃদ্ধা এসে তার বাসস্থানের এ করুন অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলো। জানতে পারল বাদশাহ এ কাজটি করেছে। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে, আয় আল্লাহ্! অত্যাচারী বাদশাহ আমার ঘরটি ভেঙ্গে ফেলেছে, আমি এখানে ছিলাম না, কিন্তু আপনিতো ছিলেন? বৃদ্ধার ফরিয়াদ আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পৌছতে দেরী হলো না। আল্লাহ্ পাক জিবরাইল (আ.) কে পাঠিয়ে দেন। যাও, অত্যাচারীর এ প্রাসাদ তার উপর ধসিয়ে দাও। এরপর জিব্রাঈল (আ.) সে অত্যাচারী বাদশাহর উপরে তার মনোরম প্রাসাদটি ধ্বসিয়ে দেন। অত্যাচারী ধ্বংস হয়ে গেল।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) লিখেন যে, এক উজির তার পুত্রসহ বন্দি হয়ে জেলখানায় আবদ্ধ হলো। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করল, আব্বাজান? আমাদের এতো প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার পরও আমরা কি কারণে এমন লাঞ্ছিত হলাম? পিতা বলে, বৎস! কোন মজলুমের বদদোয়া রাতের আঁধারে ছিঁটকে এসে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর আমরা জুলুমের ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। এর পরিণতির কথা ভাবিনি। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন সবকিছু দেখেন।

প্রিয় ভাই, ও বোনেরা!

জুলুমের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। মনে এ ভয় থাকতে হবে যে, যার উপর আমি জুলুম করছি, তার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে জুলুমের শাস্তি দুনিয়াতেই দিতে পারেন।

হযরত আবু উমামা (রাযী.) বলেন, কিয়ামতের দিন জালেম যখন জাহান্নামের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করতে থাকবে, তখন মজলুমের সাথে তার সাক্ষাত হবে। দুনিয়াতে মজলুমের উপর যে জুলুম করা হয়েছিল। সবই জালেমের স্মরণ হবে। মজলুম ব্যক্তিরা ও তাদের প্রাপ্য উসুল করতে চাইবে। তখন জালেম ও মজলুমের মাঝে তুমুল বিতর্ক হবে। শেষে মজলুম ব্যক্তিরা

জালেমদের সমস্ত নেকীগুলো নিয়ে নিবে। এতে জালেমের নেকী যদি শেষ হয়ে যায়, মজলুম যদি তার পরও পাওনা থাকে। তাহলে মজলুম ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ পাপের বোঝা জালেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে। এরপর জালেম নেকীহীন ভাবে পাপের বোঝা নিয়ে জাহান্নামের নিম্নস্তরে গিয়ে পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযী.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তখন একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিবে– যা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলে সমানভাবে শুনতে পাবে যে, আমি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারী বাদশাহ। কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যে পর্যন্ত একজন জাহান্নামী ব্যক্তি ও তার কাছে কোন জুলুমের বদলা দাবী করবে। এমনকি একট থাপ্পর ও পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন জাহান্নামী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কারও জুলুমের বদলা পাওনা থাকবে। এমনকি একটি থাপ্পরও যদি পাওনা থাকে তাও পরিশোধ করতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সেদিনের কথা চিন্তা করুন। যে দিন অত্যাচারী আর অপরাধীরা অসহায় হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আরও কিছুদিন সময় দিন, ক'টা দিনের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার আদেশের উপর চলতে পারি। আল্লাহ্ পাক বলবেন। তোমরা পূর্বেও একথা বলেছিলে। মাননি। এখন শাস্তির জন্য তৈরি হও। আজ কোন দয়ামায়া পাবেনা আমার কাছ থেকে।

দুনিয়াতে মানুষ স্বাধীন। এখানে যে যা ইচ্ছা তাই করছে, করতে পারে। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কিছু জিনিস করতে নিষেধ করেছেন, আর কিছু জিনিস করতে হুকুম দিয়েছেন। মানুষ স্বাধীনতা পেয়ে তার মর্যাদা দেয়নি। আমরা দুনিয়ার এ সামান্য জীবনে একটু কষ্ট করে অনন্তকালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামাই করতে প্রস্তুত না। দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ বিলাসে পড়ে যা ইচ্ছা তাই করছি। মহান রাব্বুল আলামীন তা দেখেও ছাড় দিচ্ছেন। হয়ত বান্দা ক্ষমা চাইবে। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করব। যদি তওবা না করি। যদি কবরে এভাবেই চলে যাই। তাহলে আমার অবস্থা বড়ই ভয়াবহ হবে।

দুঃখ ও কষ্টের শেষ থাকবে না।

আফসোস ও অনুতাপের দিন হবে হাশরের দিন।

সত্য মিথ্যা প্রকাশ হবে সেদিন।

নিজের চোখ নিজের পাপুণ্য দেখতে পাব সেদিন।

পরকালের প্রস্তুতি

এ দুনিয়াতে মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসে না। তার কোন অধিকার নেই কোন শক্তি নেই এখানে আসার। এ আসা যাবার মাঝখানের সময়টাতে নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করা মহান সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। বরং যে মালিক ও সৃষ্টিকর্তা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। যার হুকুমে আবার এখান থেকে চলে যেতে হবে। তার নির্দেশ অনুযায়ী পথ চলতে হবে। তাহলে সফলকাম হবো।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কিছু কাজ করতে আদেশ করেছেন। আর কিছু কাজ না করতে বলেছেন। আর আমাদের সকলের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগী করে জীবন যাপন করা। এ দুনিয়া একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরা শেষ হয়ে যাব। আমাদের জীবিত করা হবে কবর থেকে।

হাশর কায়েম হবে। হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে। এক বুযুর্গ বলেছেন, হে দোস্ত! তুমি দুনিয়াতে যতটুকু সময় থাকবে; ততটুকুই দুনিয়ার জন্য চেষ্টা কর। আর যতটুকু সময় তোমাকে পরকালে থাকতে হবে, ততটুকু তুমি পরকালের জন্য চেষ্টা করো।

আজ আমরা ষাট সত্তর বছরের জিন্দেগীর জন্য কত কিছুই না করি। কত চেষ্টা, কত শ্রম, কত ঘাম ঝরাই দনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য।

আর পরকালের জীবন হবে অনন্তকাল। যার শুরু আছে শেষ নেই। সে জীবনের জন্যতো কিছুই করছি না।

উলামায়ে কিরামগণ লিখেন, যে, জমিনে আসমানের মাঝে যে খালি জায়গা আছে, তা যদি সরিষার দানা দিয়ে ভরে দেয়া হয় এবং একটি পাখি এক হাজার বছর পর পর তা থেকে একটি দানা খায়। এভাবে একসময় দেখা যাবে যে জমিন ও আসমানের মাঝে যত দানা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আখিরাতের জিন্দেগী কখনই শেষ হবে না।

সে জিন্দেগীর জন্য আমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছি? অবুঝের মত আর কত সময় নষ্ট করবো। মরণ তো আমার খুব কাছে, কিন্তু প্রস্তুতি কি নিয়েছি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি কে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি নেয়। সে হলো জ্ঞানী ব্যক্তি।

দুনিয়াতে মানুষ যতই বড় আশা করুক, যত ভাল বাড়িঘর তৈরি করুক। অবশেষে তাকে দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হাদীসে পাকে বলা হয়েছে,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থাক, যেন তুমি একজন প্রবাসী। অথবা একজন পথিক, মুসাফির।

দুনিয়ার জিন্দেগী হলো পরীক্ষার প্রস্তুতির ময়দান। ঐ পরীক্ষার প্রশ্ন হবে দুটি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রথম প্রশ্ন কবরের মধ্যে হবে। যেখানে আমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। আর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন হবে,

তোমার প্রভু কে? مَنْ رَبُّكَ =

এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে।

তোমার নবী কে? وَمَنْ نَبِيُّكَ =

এরপর তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে।

তোমার ধর্ম কি? وَمَا دِيْنُكَ =

এ তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যদি উত্তর সঠিক না হয়– তাহলে মানুষ অকৃতকার্য হয়ে যাবে।

কবরের প্রশ্নের উত্তর ঐ ব্যক্তিই দিতে পারবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত পথে চলেছে। যে ব্যক্তি হারাম খায়, সুদ ঘুস নেয়। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধ না মেনে ধন-সম্পদ কামাইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। তাদের জবান থেকে এ প্রশ্নের উত্তর বের হবে না। যে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে ছিল, কবরে যখন জিজ্ঞেস করা হবে তোমার প্রভু কে? তখনও সে বলতে পারবে না যে আমার রব আল্লাহ্ তায়ালা।

আর যে দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে মনে প্রাণে আদর্শ হিসেবে মেনেছে। তোমার নবী কে? এ প্রশ্নের উত্তর তার জন্য সহজ। সে বলবে আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের খেলাফ চলত। সুন্নাতে নববীকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করত। সুন্নাতের অনুসারীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত, তার জন্য তোমার নবী কে? এর জবাব দেয়া সম্ভব হবে না।

এমনই ভাবে যে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। সে উত্তর দিবে। আমার দ্বীন ইসলাম। আর যে মুসলমান নাম নিয়ে কাফের বেদ্বীনদের মতো চলাফেরা করতো। তার জবান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আজ আমরা কত অবুঝের মত কথা বলি, যে আমার তো মাত্র বিশ পঁচিশ বছর বয়স হলো। এ বয়সে দাঁড়ি রাখলে বুড়া বুড়া লাগবে। আর কেউ কেউ আছে, নামাযের কথা বললে বলে, যুবক বয়সে একটু আনন্দ ফুর্তি করে নেই। এখনই যদি দরবেশ হয়ে যাই, তাহলে দুনিয়ার আরাম আয়েশ সব হারাবো। নামায আরেকটু বয়স হলে পড়ব। একথাগুলো কেউ প্রকাশ্যে বলে, আবার কেউ মনের ভেতর গোপন রেখে তা পালন করে। আল্লাহ্ সবাইকে মাফ করুন।

আচ্ছা বলুনতো, আমরা কি ভেবেছি যে মৃত্যু আমার জন্য আমার বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? আমরা কি ভাবে নিশ্চিত হলাম যে মৃত্যু আমাকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করবে না? আমাদের সামনে কি এমন শত শত ঘটনা ঘটছে না? যে, শিশু বালক, যুবক-প্রৌঢ় বয়সের মানুষগুলো কবরে শুয়ে আছে? এরপরও আমরা উদাসীন। শিক্ষাগ্রহণ করি না। আল্লাহ্ তুমি আমাদের সঠিক বুঝ দাও। আমীন।

কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ

যখন তাদের নির্ধারিত সময় আসবে, অর্থাৎ মৃত্যু এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত সময়ের জন্য পিছিয়ে যেতে পারবে না এবং এগুতেও পারবে না। (সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৯)

মৃত্যু এসে গেলে এক মুহূর্তও পিছাবে না। সময় নির্ধারিত। আমাদেরকে সময় মত এর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। যদি পানির পেয়ালাটাও হাতে থাকে। আর আমি মুখে পানি নিয়েছি খাওয়ার জন্য। এমনকি পানি গলার অর্ধেক পৌঁছেছে। এমন সময়ও আমার জান কবজ করা হবে। সময় নির্ধারিত। একটুও হেরফের হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সময় থাকতে প্রস্তুতি নেয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে

এক বাদশাহর একটি বিশাল বাগান ছিল। এ বাগানের কয়েকটি অংশ ছিল। প্রত্যেক অংশেই বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ লাগানো ছিল। একদিন বাদশাহ একজন লোককে পাঠালেন, যে ঐ বাগান থেকে ফল নিয়ে এসো। তুমি চেষ্টা করবে ভাল ফল আনতে। তাহলে আমি খুশি হয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবো। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে, তাহলো বাগানের যে স্থান দিয়ে

একবার যাবে সেখানে দ্বিতীয়বার যেতে পারবে না। এরপর সে লোক কাজ হতে নিল। বাগানে প্রবেশ করেই এক অংশে দেখতে পেল অনেক ভাল ফল হয়েছে। সে মনে মনে ভাবল এখান থেকে ভাল দেখে ফল ছিঁড়ে নেই। আবার ভাবল, এত সুন্দর বাগান, সামনে মনে হয় আরও সুন্দর ফল আছে, সামনের অংশ দেখে নেই। সে যখন পরবর্তী অংশে প্রবেশ করল, দেখল সেখানে আরও ভাল ফল আছে। মনে মনে ভাবল এখান থেকেই ফল ছিঁড়ব। আবার খেয়াল হলো সামনে গিয়ে দেখি আরও ভাল ফল হয়ত পাব। সামনে গিয়ে দেখল সেখানে পূর্বের চেয়ে আরও ভাল ফল ধরেছে। সে ভাবল এখান থেকেই ফল ছিঁড়ব। অন্তরে খেয়াল আসল, শেষ অংশে গিয়ে দেখি হয়ত সেখানে আরও ভাল ফল আছে। সে যখন শেষ অংশে প্রবেশ করল, দেখল সেখানে কোন ফল নেই, শুধু গাছ।

লোকটি নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করে কাঁদল। আর বলতে থাকে, আমি যদি জানতাম এমন হবে, তাহলে প্রথম অংশ থেকেই ফল সংগ্রহ করতাম। তাহলে তো আজ আমাাকে বাদশাহর কাছে লজ্জিত হতে হতো না।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমাদের জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমনই। আমার জীবনের প্রত্যেকটা দিন আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনগুলো যদি এভাবে অবহেলা করে পার করি, তাহলে পরকালে কান্নার শেষ থাকবে না।

আজ নয় কাল থেকে নেক আমল করবো, এমন মনোভাব যদি থাকে তাহলে কাল কাল করতে করতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু এসে যাবে। কবরে আমার চিরস্থায়ী জীবনের শুরু হবে। দুনিয়ায় ধর্মীয় ব্যাপারে কত অবহেলা করেছি, সেদিন তার জন্য বড় আফসোস হবে। আফসোস করে বলব, হায়! দুনিয়াতে যদি যাবার একটু সুযোগ মিলত, তাহলে কিছু নেক আমল করে আসতাম। কিন্তু এ আফসোসের কি লাভ? দুনিয়ার জিন্দেগীর পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

এ জন্যই সময়ের গুরুত্ব বুঝা ও এর মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী।

তওবা

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা ও গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো আল্লাহ্ তায়ালার ভয়। আযাবের ভয় অন্তরে থাকা। আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের কথা স্মরণ রাখা। আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টি ও পাকড়াওয়ের কথা মনে করা।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম অমান্য করে তাদের ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, বা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়। (সূরা নূর, আয়াত ৬৩)

সাইয়ীদুনা হযরত হাসান (রাযী.) বলেন, তোমাদের পূর্বে যেসব বুযুর্গগণ (সাহাবায়ে কিরামগণ) ছিলেন, তারা গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কংকর পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় দান করলেও পাপের ভয়ে ও আশংকায় শংকিত থাকতেন। পরলৌকিক মুক্তি ও পরিত্রাণের আশা পোষণ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যা শুনতে পাই, তোমরা কি তা শুনতে পাও? আমি শুনছি আকাশ মণ্ডলী কড় কড় আওয়াজ করছে। সে পবিত্র সত্ত্বার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন, আসমানে চার আঙ্গুলী পরিমাণ জায়গাও এমন নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সিজদা অথবা দাঁড়ানো, অথবা রুকুর হালতে মগ্ন না রয়েছে। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা অধিক পরিমাণে কাঁদতে। এবং কম হাসি-ঠাট্টা করতে। এবং তোমরা জনপদ ছেড়ে পাহাড় পর্বতের দিকে ছুটে যেতে। যেখানে তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ভয়াবহ ও কঠিনতম শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে।

আমরা কেউ বলতে পারিনা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমরা পরিত্রাণ পাব কি পাব না। আজ আমরা হাসতে হাসতে নির্দ্বিধায় গুনাহে লিপ্ত হচ্ছি, কিন্তু আমাদেরকে এর জন্য কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যেতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

পাপাচার ছেড়ে আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের ভয় করুন। আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের আশা করুন। আমরা তো পাপাচার আর অনাচার করে দুনিয়াটা ভরে ফেলেছি। নিজেদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার আযাব গজবের যোগ্য করে ফেলেছি। এখন একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার ভয় আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। তাঁর দরবারে নিঃস্বার্থ তওবা আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। বান্দার তওবা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খুব প্রিয়। বান্দার অনুতপ্ত হৃদয়ের আকুতি আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে

আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের সে ভয়াবহ দিনেও আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক হলো, যারা একাকিত্বে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা স্মরণ করে নিজের অবাধ্যতাও পাপের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। তওবাও অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِيْ جُوْفِ الَّيلُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى

দোযখের আগুন সে চক্ষুকে কোনদিন স্পর্শ করবে না, যে চক্ষু আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে কেঁদেছে। এমনই ভাবে যে চক্ষু আল্লাহ্ তায়ালার পথে পাহারায় জাগ্রত ছিল তাকেও আগুন স্পর্শ করবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযী.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল চোখই রোদন করবে কেয়ামতের দিন। কেবলমাত্র ঐ চোখগুলো ছাড়া, যেগুলো আল্লাহ্ তায়ালার নিষেধ করা বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থেকেছে। অথবা আল্লাহ্ তায়ালার পথে জিহাদ ও মুজাহাদায় থাকার দরুণ রাতে জাগ্রত ছিল, অথবা আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করে মাছির মস্তক পরিমাণ হলেও অশ্রুপাত করেছে।

হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনা

একদিন এক গুনাহগার বান্দা গুনাহ করার পর অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আরজ করল, ইয়া আল্লাহ্! আমি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, আমার প্রতি বান্দার ঈমান আছে, সে বিশ্বাস করে যে, আমি মাফ করে থাকি। গুনাহের জন্য শাস্তি দেই। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাফ করে দেন।

সে বান্দা কিছুকাল পাপ কাজ থেকে বিরত ছিল। একদিন আবার সে পাপ করে ফেলে। আবার তার অন্তরে অনুশোচনা আসে, সে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ক্ষমা চাইল। তার গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেন। কিছুদিন পর সে আবারও গুনাহ করল। তার হৃদয়ে অনুশোচনা এলো।

সে আবার আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আরজ করল, বলে, ওগো মাওলা! আমি আবার গুনাহ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, তার একজন রব আছে, যিনি গুনাহ মাফ করেন, গুনাহের কারণে শাস্তি প্রদান করেন। এরপর তাকে পুনরায় মাফ করে দেন। এখন যা ইচ্ছা সে করুক। (বোখারী-মুসলিম)

ইমাম মুনজির (রহ.) এ কথাটির (যা ইচ্ছা সে করুক) ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন, যে বান্দার দ্বারা গুনাহ হয়ে যাবার পর স্বচ্ছ মনে এবং পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা ও এস্তেগফার করলে এ তাওবা ও এস্তেগফার তার অতীতের গুনাহের কাফফারা হবে। অর্থাৎ সত্যিকারের তওবা ও ইস্তেগফারের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা ও পুনরায় গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই।

হযরত মুআজ (রাযী.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হাত ধরে এক মাইল পর্যন্ত চললেন। এরপর বলেন, ওহে মুআজ! তোমাকে আমি নসিহত করি।

আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর।

সত্য বল, ওয়াদা পূরণ কর।

আমানত রক্ষা করো। খেয়ানত পরিত্যাগ কর।

এতিমের প্রতি রহম কর।

প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। রাগ হজম করো। নম্র ব্যবহার কর। কোন মুসলমানকে কটু বাক্য বল না।

সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহর অনুগত থাক।

কোরআনের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি কর।

আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হও। কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের ভয় করো।

দুনিয়ার আশা ভরসা কম করো। সর্বদা নেক আমলে মশগুল থাকো। হে মুআয! আমি তোমাকে আরও নসিহত করি।

কোন মুসলমানকে হেয় করো না।

সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলো না।

আল্লাহ্ তায়ালার জমিনে ফেতনা ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না।

হে মুআয! তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি সর্বত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ কর। গুনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করো। গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা আর প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, অনুতাপকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের আশা করতে পারে। কিন্তু হঠকারী প্রতারক ব্যক্তি যেন আল্লাহর গজবের প্রতীক্ষায় থাকে।

হে আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাগণ! একদিন না একদিন আমলনামা অবশ্যই তোমার হাতে আসবে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই তার ভালমন্দ প্রত্যক্ষ করে নিবে। কিন্তু পরিণাম তারই ভাল হবে, যার শেষ অবস্থা ভাল হবে। দিবা রাত্রির প্রতিটা মুহূর্ত আপন গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। অতএব শীঘ্রই আখিরাতের প্রস্তুতি নাও। আমলের দিকে এগিয়ে যাও। অলসতা ও টাল বাহানাকে মোটেও প্রশ্রয় দিও না। কারণ মৃত্যু এমন এক বস্তু, যা হঠাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে। তখন তোমার করার কিছু থাকবে না। সাবধান! আল্লাহ্ তায়ালার অনন্ত ধৈর্য ও ক্ষমার দৃষ্টান্তকে পুঁজি করে নিজেকে ধোঁকায় ফেল না।

বায়হাকী শরীফের হাদীস, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হলো, সে যেন আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ঠাট্টা করল।

তওবার একটি ঘটনা

হযরত উমর (রাযী.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহুবার বলতে শুনেছি, একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার নয়, সাতবারও নয়। আরও বেশি বার বলতে শুনেছি। বনী ইসরাইলের এক ধনাট্য ব্যক্তি অশ্লীল অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। একদিন এক মহিলা তার কাছে হাজির হলো সাহায্যের জন্য। ধনাট্য ব্যক্তি মহিলাকে ষাট দিনার দিয়ে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করল। লোকটি যখন নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য তৈরি হলো, তখন মহিলাটির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। মহিলা কাঁদতে থাকে। লোকটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এমন করছো কেন? তাহলে কি আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

মহিলাটি বলে, না বরং আমি কাঁদছি এ কারণে যে জীবনে কোনদিন ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি। আজকে শুধু মাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এ কাজের জন্য বাধ্য হচ্ছি। এ জন্যই আমি বিচলিত, ভীত। লোকটি বলে,

তোমার এহেন ভূখা ফাকা ও দরিদ্র অবস্থায়ও তুমি এ পাপ কাজ থেকে বাঁচতে চাইছো! আর এ কাজে তুমি জীবনেও লিপ্ত হওনি।

যাও এ দিনারগুলো তোমার জন্য। আর আল্লাহ্ তায়ালার কসম করে বলছি, আমিও ভবিষ্যতে এ কাজ আর কোনদিন করব না।

আল্লাহ্ তায়ালার কি কুদরত, সে রাতেই লোকটির মৃত্যু হয়। লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বাড়ির দরজায় লেখা, আল্লাহ্ তায়ালা এ লোকটিকে মাফ করে দিয়েছেন। (তিরমিযী)

তওবার ঘটনা

(১) আল্লাহ্ তায়ালার নবী হযরত মুসা (আ.) এর জামানায় এক ব্যক্তি ছিল, যে তওবা করে আবার গুনাহ্ করত। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) কে ওহির মাধ্যমে বলেন, হে মুসা! ঐ ব্যক্তিকে বলে দাও, সে যদি আবার তওবা করে তা ভঙ্গ করে, তাহলে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবো এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিব। হযরত মুসা (আ.) এ কথাটি সে ব্যক্তিকে জানিয়ে দেন। এরপর লোকটি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরল। গুনাহ মুক্ত জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু সে অধৈর্য্য হয়ে আবার গুনাহ্ করে ফেলে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুসা (আ.) এর মাধ্যমে সে লোকটিকে বলেন, আমি এ অবাধ্য বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট।

লোকটি হযরত মুসা (আ.) থেকে এ সংবাদ শুনে জঙ্গলে চলে গেল। নির্জনে বসে আল্লাহ্ তায়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! রাহমানুর রাহীম। আপনি মুসা (আ.) এর মাধ্যমে আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট। হে পরওয়ার দেগার! আমার অবাধ্যতায় আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমাকে ক্ষমা করলে আপনার রহমতের ভাণ্ডার একটুও খালি হবে না। আমার গুনাহ্ কি আপনার ক্ষমার চেয়ে বড়? যখন ক্ষমাশীল আপনার সিফাত, সে ক্ষমা কি আপনি আমাকে দান করবেন না? হে আল্লাহ্! রাহমানুর রাহীম! আপনি যদি বান্দাকে নিরাশ করেন, তাহলে অসহায় বান্দা কোথায় যাবে? কার দরজায় ক্ষমা চাবে? আপনার দরবার থেকে ব্যর্থ হয়ে বান্দা কার আশ্রয়ে যাবে? আয় আল্লাহ্! যদি আপনার রহমত খতম হয়ে গিয়ে থাকে, আর আপনার আযাব যদি আমার উপর আবশ্যক হয়, তাহলে আপনি দুনিয়ার সকল বান্দাদের গুনাহ আমার উপর ঢেলে দিন। আমি সব গুনাহ নিজের উপর নিয়ে নিব।

বান্দার এ কাকুতি মিনতিতে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের দরিয়ায় জোশ উঠে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) এর মাধ্যমে সংবাদ পাঠালেন যে, হে

আমার অবাধ্য বান্দা! তুমি আমার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ নও, তোমার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় । যে আমি ক্ষমা করতে পারি । শাস্তি দিতে পারি । যদি তোমার অন্যায় জমিন ও আসমান পর্যন্ত ছেয়ে যায়, এরপরও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কারণ আমার রহমত ও ক্ষমাশীলতার প্রতি তোমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে ।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের পাপ ক্ষমা করেন । যদি বান্দা খাঁটি মনে তওবা করে । আল্লাহ্ পাক বান্দাকে সুযোগ দিয়েছেন, যেন কোন ভুল হলে তা শোধরে নিতে পারে । তওবা করে নিজেকে পবিত্র করতে পারে । এটা বান্দার প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহ ।

মদ পানকারীর তওবা

হযরত যুননুন মিসরি (রহ.) নিজ চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেন, একদিন আমি নদীর কিনারে ছিলাম । এমন সময় নদীর পারে একটি বিচ্ছু দেখলাম । এ সময় নদীতে একটি ব্যাঙ ভেসে উঠল । আর তৎক্ষণাৎ বিচ্ছুটি ব্যাঙের পিঠে চড়ে নদীর অপর তীরে পৌছল । এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে জুন্নুন মিসরী ভাবলেন, নিশ্চয়ই এ বিচ্ছুটির কোন মিশন আছে । এরপর আমি বিচ্ছুটির অনুসরণ করলাম । হঠাৎ এক স্থানে গিয়ে দেখি এক যুবক মদপান করে মাতাল হয়ে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত । এ দিকে বিশাল এক সাপ ঘুমন্ত যুবককে দংশন করতে ফণা তুলে তৈরি । ঠিক এ সময় বিচ্ছুটি সাপের মাথায় উঠে সাপটিকে দংশর করল । এক পর্যায়ে সাপটি মারা গেল । বিচ্ছুটি কাজ শেষ করে আবার ব্যাঙের পিঠে চড়ে নিজের জায়গায় চলে যায় ।

হযরত যুন্নুন মিসরি (রহ.) ঘুমন্ত যুবকটিকে নাড়া দেন, এতে যুবকটি চোখ মেলে তাকায় । জুন্নুন মিসরী (রহ.) যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে যুবক! তুমিতো জাননা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তোমাকে কত ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন । এ মৃত সাপটি তোমাকে দংশন করতে এসেছিল, একটি বিচ্ছু এ সাপটিকে হত্যা করেছে ।

তখন জুন্নুন মিসরী (রহ.) আবেগে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন ।

يَا غَافِلُ وَالْجَلِيْلُ يَحْرِسُهُ ❁ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ يَدُبُّ فِي الظُّلَمِ

হে উদাসী! তুমি দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা থেকে উদাসীন হয়ে রয়েছো । অথচ মহান আল্লাহ্ তায়ালা পাহারা দিচ্ছেন তোমাকে । সর্বপ্রকার অন্ধকারের বিপদ থেকে ।

كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُوْنَ عَنْ مَلِكٍ تَأْتِيْهِ مِنْهُ فُؤَادُ النَّعِيْمِ

কিভাবে তোমার চোখ দুটি নিদ্রা যাচ্ছে, শাহেন শাহকে ভুলে? অথচ তোমরা সর্বদা তার পক্ষ হতে নিয়ামত রাজির উপকারিতা ভোগ করছ।

এরপর মাদকাশক্ত যুবক বিস্ময়ের সাথে বলে, হে মহান রাব্বুল আলামীন! আপনি যদি আপনার অবাধ্য বান্দার প্রতি এমন রহমত করেন, তাহলে আপনার অনুগত বান্দার প্রতি আপনার করুণা কেমন হয়ে থাকে? এরপর যুবকটি আল্লাহ্ তায়ালার কসম খেয়ে বলে, আমি আর কখনও মদস্পর্শ করব না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা প্রতিটা ক্ষণে মহান রাব্বুল আলামীনের অগণিত রহমতের সমুদ্রে ভাসছি। কিন্তু এরপরও আমরা এমন রহমানুর রাহীমকে ভুলে যাচ্ছি। তার অবাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর অনুগত বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

চল্লিশ বছর নাফরমানী করেও ক্ষমা লাভ

হযরত মুসা (আ.) এর যমানায় বনী ইসরাইলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ফলে জনগণ হযরত মুসা (আ.) এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! আপনি আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। তাদের অনুরোধে হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলের সত্তর হাজার লোকের জামায়াত নিয়ে এক মরু প্রান্তরে যান। সবাইকে নিয়ে দোয়া আরম্ভ করেন। হে আল্লাহ্! আমাদের উপর আপনার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন। আপনার করুণা দ্বারা আমাদের সিক্ত করুন। হে আল্লাহ্! দুধের শিশু, পশু, পাখি, গাছপালা তোমার দরবারে রুকুকারী বৃদ্ধদের উসিলায় আমাদের উপর রহম করুন।

এ সময় সূর্যের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। হযরত মুসা (আ.) আবারও আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আর্জি পেশ করতে লাগলেন। হে আল্লাহ্! আমার মর্যাদা যদি আপনার দরবারে জীর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে শেষ যমানার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) এর কাছে ওহী পাঠালেন, হে মুসা! আমার দরবারে তোমার মর্যাদা কমেনি। আমার কাছে তোমার মর্যাদা অটুট আছে। কিন্তু এ মজলিসে এমন একজন লোক আছে, যে চল্লিশ বছর যাবত আমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছে, আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তুমি ঘোষণা করে

দাও, যেন সে লোকটি তোমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যায়। তার কারণে আমি তোমাদেরকে আমার রহমতের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছি। হযরত মুসা (আ.) ঘোষণা করে দেন, হে অমুক অপরাধী বান্দা! যে চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতায় লিপ্ত, আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।

তোমার কারণে আমরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এ ঘোষণা শোনার পর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো, আশে পাশে তাকিয়ে দেখল, আর কেউ দাঁড়ায়নি। সে বুঝল, তাকে উদ্দেশ্য করেই এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সে মনে মনে ভাবল, আমি যদি এখন এখান থেকে বের হই, তাহলে বনী ইসরাইলের সবাই জানবে আমি নাফরমান। এটা আমার জন্য চরম লজ্জাকর ব্যাপার। এতে আমি অপমানিত হবো। আর যদি না বের হই, তাহলে, রহমতের বৃষ্টি আসবে না। তাই সে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিজেকে সোপর্দ করার ইচ্ছা করল। সে কাপড়ের মাধ্যমে নিজের মাথা আবৃত করে নিজের কৃত পাপ পঙ্কিল কর্মকাণ্ডের জন্য তওবা করল। বললো, হে আল্লাহ্! হে আমার পালনকর্তা, আমার রিযিকদাতা, দুনিয়ার মালিক! আমি চল্লিশ বছর ধরে আপনার অবাধ্যতা করে আসছি। আজ আমি আমার কৃত গুনাহগুলো থেকে তওবা করে আপনার অনুগত বান্দা হয়ে আপনার মহান দরবারে হাজির হয়েছি। আমাকে আপনি কবুল করুন, আল্লাহ্! তার কথা শেষ না হতেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা আরম্ভ হলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে।

হঠাৎ বৃষ্টি বর্ষণের এ দৃশ্য দেখে হযরত মুসা (আ.) বলেন, হে আল্লাহ্! কি কারণে আমাদের প্রতি আপনার অনুকম্পার বৃষ্টি বর্ষিত হলো? অথচ আমার ঘোষণায় একজনও এখান থেকে বের হয়নি! আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুসা! যার কারণে বৃষ্টি থেকে তোমাদের বঞ্চিত রেখেছিলাম, তার কারণেই তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।

হযরত মুসা (আ.) আরজ করেন, হে আল্লাহ্! আপনার একান্ত অনুগত বান্দাকে আমাকে দেখার সুযোগ করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে মুসা! এতদিন যাবত সে আমার অবাধ্যতা করেছে, এরপরও আমি তাকে অপমান করিনি। এখন সে আমার অনুগত ও বাধ্যগত বান্দায় পরিণত হযেছে, এখন কিভাবে তাকে অপমানিত অপদস্ত করব?

চোখের হেফাজতের একটি ঘটনা

সাহাবী হযরত কাব (রাযী.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মুসা (আ.) এর সময়ে বনী ইসরাইলে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ নাজুক

অবস্থায় বনী ইসরাইলের মানুষ হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে এসে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করল। হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলীদেরকে তার সঙ্গে পাহাড়ে আরোহণের জন্য বলেন। নির্দেশ মত সবাই পাহাড়ে গেল। হযরত মুসা (আ.) বলেন, এমন কোন ব্যক্তি যাতে আমার সাথে না আসে, যে তার জীবনে গুনাহ্ করেছে। এ ঘোষণার পর অধিকাংশ লোক ফেরত চলে গেল। এরপর আবারও ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করেছে, সে যেন আমার সাথে না আসে। এ ঘোষণার পর একজন বাদে আর সবাই চলে গেল। সে ব্যক্তির নাম ছিল বরখুল।

বরখুল আবেদ নামে সবাই তাকে চিনত। হযরত মুসা (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সবাই চলে গেছে, আর তুমি রয়ে গেলে? তোমার জীবনে কি কোন গুনাহ নেই? আমার কথা কি তুমি শোননি? সে উত্তর দিল, হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আমার জীবনে কোন গুনাহ্ করেছি বলে আমার জানা নেই। তবে একটি বিষয় আমার মনে পড়ছে, তা যদি গুনাহ্ হয় তাহলে আমিও ফেরত চলে যাব।

হযরত মুসা (আ.) জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি?

সে বলে, একদিন রাস্তায় চলাচলের সময় একটি বাড়ির খোলা দরজার দিকে আমার নজর পড়েছিল। সেখানে একজন ব্যক্তিকে আমার নজরে পড়েছিল। এ অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ঘরের দিকে নজর দেয়ার কারণে আমার অন্তরে খুব অনুশোচনা এলো। তৎক্ষণাৎ আমি আমার চোখকে সম্বোধন করে বললাম, আমার দেহে অবস্থান করে অন্যের ঘরের প্রতি নজর দিয়েছিস? এ বলে আঙ্গুল দিয়ে সে চোখটি উপড়ে ফেললাম। এখন বলুন হে আল্লাহ্ তায়ালার নবী! এটা যদি গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে আমি চলে যাব।

হযরত মুসা (আ.) বলেন, এটি কোন গুনাহ নয়। এরপর হযরত মুসা (আ.) বরখুলকে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোয়া করতে বলেন। বরখুল দোয়া করতে শুরু করল, ইয়া কুদ্দুসু! হে মহা পবিত্র! আপনার কাছে যা আছে তা কোনদিন শেষ হবে না। আপনার ভাণ্ডার কখনো ফুরায় না। আপনাকে কৃপণতার দোষে দোষারোপও করা যায় না। আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী হযরত কাব (রাযী.) বলেন, তার দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, দু'জন কাদামাটি পেরিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণে তৌফিক দিন, আমরা যেন আমাদের চোখকে কুদৃষ্টি থেকে হেফাযত করতে পারি। আমীন।

এক শাহ্জাদার তওবা

বনী ইসরাইলের এক বাদশাহ দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিল। এ দীর্ঘ হায়াতে সে অঢেল ধন-সম্পদ, অনেক সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিল। তার সন্তানরা যখন বড় হতো, তখন তারা দুনিয়ার আরাম আয়েশ ছেড়ে পশমের পোশাক পড়ে বনে জঙ্গলে চলে যেত। তারা দুনিয়াবিমুখ হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরত। আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে জীবন কাটিয়ে দিত। এ অবস্থায়ই বাদশাহর বংশধারা চলতে থাকে।

বাদশাহ তখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, এ বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আরেকটি পুত্র সন্তান দেন। বাদশাহর আশংকা হলো এ পুত্রটিও তার পূর্বসুরী ভাইদের মত দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাবে। তাই বাদশাহ তার গোত্রের লোকদের একত্রিত করে বলে, আমি বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছি। এখন যদি সে ও তার ভাইদের মত দুনিয়াবিমুখ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের বংশ থেকে রাজত্ব খতম হয়ে যাবে।

সুতরাং তোমরা আমার সন্তানটিকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের দিকে আকৃষ্ট করে গড়ে তুলবে। তাতে আমার বংশ যেমন রক্ষা হবে। আর তোমাদের বংশে রাজত্বের ধারাবাহিকতাও রক্ষা হবে।

এরপর সেই শাহজাদার জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাগান বাড়ি তৈরি করা হলো। শাহজাদা দীর্ঘদিন যাবৎ সে প্রাচীর ঘেরা বাগান বাড়িতেই কাটাতে থাকে। এক সময় সে পরিণত বয়সে উপনীত হলো।

একদিন শাহজাদা প্রাচীর বেষ্টিত বাগান বাড়িতে ঘুরাফেরা করতে করতে বুঝতে পারল। আসলে সে প্রাচীরবেষ্টিত একটি এলাকায় আবদ্ধ হয়ে আছে। সে আরও বুঝতে পারল, এর বাহিরে আরও একটি জগত আছে। তা সম্পর্কে জানার ও দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সে তার দেখা শোনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটিকে বলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ প্রাচীরের বাইরে আরও একটি বিশাল জগত আছে। তোমরা আমাকে এ প্রাচীর ঘেরা স্থান থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আমি সে জগত সম্পর্কে জানতে চাই, আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে চাই।

শাহজাদার এ অবস্থা বাদশাহকে জানানো হলো। বাদশাহ এ সংবাদ শুনে চিন্তিত হলেন। আশংকা করেন, তার এ পুত্রটিও স্বীয় ভাইদের মত আচরণ করছে। তাই বাদশাহ তার লোকদেরকে হুকুম দেন, তোমরা তার সামনে আনন্দ ফূর্তির সমস্ত উপকরণ হাজির করো। আনন্দ ফূর্তির যাবতীয় উপকরণ তার সামনে হাজির করা হলে শাহজাদা এক বছর পর্যন্ত বহির্জগতের কথা ভুলে গেল।

এক বছর পর শাহজাদা আবার আবদার করল যে অবশ্যই আমাকে বাইরের জগত সম্পর্কে জানতে হবে। আমাকে বহির্জগতে নিয়ে যাও। শাহজাদার আবেদনটি বাদশাহকে জানানো হলো। বাদশাহ চিন্তাভাবনা করে অনুমতি দিয়ে দিলেন। বাদশাহর অনুমতি পেয়ে শাহজাদা তার সহগামীদের নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বের হলো।

শাহজাদা ভ্রমণ করছে, এ সময় একজন রোগাক্রান্ত, দুর্বল লোকের সাথে শাহজাদার দেখা হলো। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, এ লোকটির এ অবস্থা কেন?

সঙ্গীরা জবাব দিল, সে একজন বিপদগ্রস্ত রোগাক্রান্ত মানুষ।

শাহজাদা বলে, তা কি বিশেষ কিছু মানুষেরই হয়, নাকি প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়?

সঙ্গীরা বলে, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এমন হওয়ার আশংকা করা যায়।

এরপর শাহজাদা জিজ্ঞাস করল, এ যে আমি এ শান শওকতের সাথে আছি। আমারও কি এমনটা হওয়ার আশংকা আছে?

সঙ্গীরা বলে, হ্যাঁ আশংকা আছে।

শাহজাদা বলে, তোমাদের এ জীবন যাত্রার প্রতি আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। এরপর শাহজাদার ভ্রমণ কাহিনী বাদশাহকে জানানো হলো। বাদশাহ বলে, তার মন থেকে এসব দুঃশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করার জন্য ক্রীড়া কৌতুক আমোদ ফূর্তির যাবতীয় উপকরণ তার সামনে পেশ করো। সব হাজির করা হলো।

এভাবে শাহজাদার আরও একটি বছর কেটে গেল। একদিন শাহজাদা আবারও বাহিরে যাবার অনুমতি চাইল। আবারও শাহজাদা পূর্ণ শানশওকতের সাথে বহির্জগত দেখতে বের হলো। চলার পথে সে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল। বয়সের ভারে যার দেহটা নুয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, এর এ অবস্থা কেন? সঙ্গীরা উত্তর দিল, ইনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। শাহজাদা জিজ্ঞেস করল এ অবস্থা কি বিশেষ কিছু মানুষের হয়, নাকি সবাই এমন পরিণতি ভোগ করে? সঙ্গীরা বলে, দীর্ঘ জীবন লাভকারী সব মানুষই এ অবস্থার সম্মুখীন হয়। শাহজাদা বলে, আফসোস ও দুঃখ আমাদের এ জীবনের জন্য, যা কখনও কারও জন্য পূর্ণ নির্মল ও স্বচ্ছ হয় না।

এরপর শাহজাদার ভোগ বিলাসের সব উপকরণ দিযে শাহজাদাকে দুনিয়ামুখী করার চেষ্টা চলল। এভাবে আরও একবছর কেটে গেল।

আবার শাহজাদা বাহিরে বের হওয়ার আবদার করল। তার আবদার পূর্ণ করা হলো। জাঁকজমকের সাথে শাহজাদা বের হলো। চলার পথে কিছু মানুষকে

দেখতে পেল, খাটিয়া কাঁধে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, এরা খাটিয়া নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? খাটিয়াতেই বা কি?

সঙ্গীরা বলে, খাটিয়ায় একজন মৃত মানুষকে বহন করে নেয়া হচ্ছে, তাকে কবর দেয়া হবে।

শাহজাদা বলে, মৃত্যু কি? আর কবরই বা কি জিনিস? আমার সামনে ওদের নিয়ে এসো। সঙ্গীরা খাটিয়া সহ লাশ বহনকারীদের নিয়ে এলো। শাহজাদা মৃত ব্যক্তিকে উঠে বসতে বলে। সঙ্গীরা বলে, মৃত মানুষ উঠে বসার ক্ষমতা রাখেনা। কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারেনা। শাহজাদা জানতে চাইল, তাহলে তোমরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তারা বলে, তাকে মাটির নিচে দাফন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, দাফন কি? তারা বলে, দাফন হলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা সব মৃতকে জিন্দা করবেন। এরপর হাশরের মাঠে জীবনের সকল কর্মের হিসাব নিকাশ হবে।

শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, হাশর, হিসাব নিকাশ কি?

তারা বলে, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ,

সেদিন সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের (জগতসমূহের প্রতিপালক) সামনে দাঁড়াবে। (সূরা মুতাফিফিন–আয়াত ৬)

এরপর প্রত্যেকের ভাল মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে।

শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, এ জগত ছাড়া আরও অন্য কোন জগত কি আছে? যেখানে তোমাদের আমলের বিনিময় দেয়া হবে?

তারা বলে, হে অবশ্য আছে। আমাদের সবাইকে সে জগতের মুখোমুখি হতে হবে। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

শাহজাদা একথা শুনে ঘোড়া হতে গড়িয়ে জমিনে পড়ে গেল। আর নিজের মুখমণ্ডলে ধুলাবালি মাখতে থাকে এবং সবার উদ্দেশ্য বলতে থাকে, এ বিষয়টিকেই (মৃত্যু পরবর্তী জীবন)কেই ভীষণ ভয় করছিলাম। আমার অজ্ঞাতসারে আমার উদাসীনতায় তা আমার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমার প্রতিপালক আমাকে মৃত্যু দেবেন। হাশর করাবেন। আর আমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। আজ থেকে আমার ও তোমাদের মাঝে এটাই সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি। এরপর থেকে তোমাদের কোন হস্তক্ষেপ আমার উপর চলবে না।

শাহজাদার সঙ্গীরা বলে, তোমাকে তোমার পিতার হাতে সোপর্দ করা পর্যন্ত আমরা তোমাকে একাকি ছাড়ব না।

এরপর শাহজাদাকে বাদশাহর সামনে হাজির করা হলো। বাদশাহকে বলা হলো সব কথা। বাদশাহ সন্তানকে জিজ্ঞেস করল, প্রিয় বৎস! তোমার এত উৎকণ্ঠা, এত পেরেশানী কিসের জন্য? শাহজাদা জবাব দিল, আমার উৎকণ্ঠা আমার পেরেশানী, আমার বিষণ্নতা সেদিনের জন্য, যেদিন ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। পাবে যার যার কৃত আমলের প্রতিদান। এরপর সে একটি কাপড় চেয়ে নিয়ে পরিধান করল। এরপর রাজপ্রাসাদের গেইট দিয়ে বের হওয়ার সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনীতভাবে বলে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে এমন বস্তু প্রার্থনা করি, যার স্বল্পতা ও আমার কাছে নেই। যার আধিক্যও আমার কাছে নেই।

আর এ কথা নিশ্চিত যে, ভাগ্য লিপি নির্ধারণ হয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! আমি ভালবাসি যে, পানি পানিতেই ছিল এবং মাটি মাটিতেই ছিল, আর আমার দুচোখ দ্বারা দুনিয়ার প্রতি একবারও তাকাইনি।

এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু বকর বিন আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তি এমন গুনাহ থেকে থেকে বাঁচতে দুনিয়াবী সব আরাম আয়েশ ছেড়ে জঙ্গলবাসী হয়েছেন, যার সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি গুনাহ করবেন কি না? শুধু গুনাহ হয়ে যাবার আশংকায় তিনি শংকিত, ভীত।

তাহলে চিন্তার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত। আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতায় নিয়োজিত এবং সে নিজেও জানে যে সে পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ এ কারণে সে উৎকণ্ঠিত হচ্ছে না। বিচলিত নয়। তওবাও করছে না।

এক পাপী যুবকের অন্তিম সময়ের তওবা

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর একজন মুরিদ ছিল মহিলা। সে মহিলা নিয়মিত হযরত হাসান বসরির ওয়াজ নসিহত শোনার জন্য আসতেন। মহিলার একটি ছেলে ছিল। মহিলা নেক্কার ছিলেন। ছেলেটি ছোট থাকতেই মহিলার স্বামী মারা গেল। স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। প্রচুর সম্পদ ছিল।

স্বামী মারা যাবার পর মহিলার কাছে অনেক বিবাহের প্রস্তাব আসছিল। মহিলা ভাবলেন, আমার একটি ছেলে আছে, এখন যদি আমি অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, তাহলে আমার ছেলেটি নষ্ট হয়ে যাবে। তার কোন

অভিভাবক থাকবে না। আর জানা নেই নতুন স্বামী আমার সাথে কিরূপ আচরণ করে। এ সন্তানই আমার ভরসা। এসব ভেবে মহিলা আর বিবাহ করেননি।

এ দিকে ছেলে যৌবনে পদার্পণ করে। সে মন্দ লোকদের সাথে জড়িয়ে যায়।

যেহেতু প্রচুর সম্পদ ছিল, তাই মন্দ লোকগুলো তার সাথে ভিড়তে থাকে। সে মদ আর নারীতে ডুবে গেল। ছেলের এ অবস্থা দেখে মা তাকে বুঝাতেন, কিন্তু ছেলের সেদিকে খেয়াল নেই। সে পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে খরচ করতে থাকে।

মা কোন উপায় না দেখে ছেলেকে হযরত হাসান বসরীর কাছে নিয়ে যান। হযরত হাসান বসরীও তাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু ছেলেটির ভালর দিকে কোন খেয়ালই ছিল না। এভাবে অনেকদিন তাকে বুঝানো হলো। সে যে পথে চলছে তা খারাপ পথ। মা ছেলের জন্য দোয়া করতেন, হযরত হাসান বসরীও দোয়া করতেন। কোন কিছুতেই তাকে আছর করল না। হাসান বসরী (রহ.) এর মনে খেয়াল আসল, যে এ ছেলের অন্তরে মোহর লেগে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ছেলেটি মন্দ পথে চলতে চলতে শারীরিক সুস্থ্যতা ও ধন-সম্পদ সবই নষ্ট করে ফেলে। তার শরীরে বিভিন্ন জটিল রোগ দেখা দেয়। সে বিছানায় পড়ে গেল। সে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল যে, তার সামনে আখিরাতের সফর ভেসে উঠল। এ সময়ও মা ছেলেকে বুঝাতেন বেটা আমার! এখনও সময় আছে, তওবা কর। খাছ দিলে তওবা করলে আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করেন। একথাটা তার মনে আছর করল, সে বলতে থাকে, মা! আমি কিভাবে তওবা করব? আমিতো গুনাহ করতে করতে জীবনটাই শেষ করে এসেছি। এ গুনাহের কি ক্ষমা আছে?

মা বলেন, বেটা! হযরত হাসান বসরীর কাছে জিজ্ঞাস কর। ছেলেটি বলে, মা! আমিতো চলাফেরা করতে অক্ষম। আপনিও আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। বরং আপনি গিয়ে হযরত হাসান বসরীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসুন।

মা বলেন, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। এরপর ছেলে বলে, মা! আপনি ফিরে আসার আগেই যদি আমি মারা যাই, তাহলে হযরতকে বলবেন আমার জানাযা পড়াতে। মা হযরত হাসান বসরীর কাছে যান। হযরত হাসান বসরী তখন দুপুরে খানা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মা দরজায় আওয়াজ দেন। হযরত হাসান বসরী জিজ্ঞেস করেন কে? মা উত্তর দেন। হযরত আমি আপনার মুরিদ। আমার

ছেলের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। সে তওবা করতে চাইছে। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের ঘরে চলুন এবং ছেলেকে তওবা করিয়ে দিন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) মনে মনে ভাবলেন, বছরের পর বছর তার পেছনে মেহনত করে কোন ফল পেলাম না। এখন আর কি হবে? মনে হয় সে আমাকে পুনরায় ধোঁকা দেবে। তিনি বলেন, আমি যেতে পারব না। মা বলেন, হযরত! সে তো এও বলেছে, যে আমার মৃত্যুর পর আমার জানাযার নামায হযরত হাসান বসরীই পড়াবেন।

হযরত হাসান বসরী বলেন, আমি তার জানাজার নামাযও পড়াবো না। কেননা সেতো কখনও নামাযই পড়েনি।

মহিলা পেরেশান হয়ে চলে যান। ছেলে মাকে কাঁদতে দেখে তার অন্তর আরও নরম হয়ে গেল। ছেলে মাকে জিজ্ঞেসা করল, মা! কাঁদছেন কেন? মা বলেন, বেটা! তোমার এ করুন অবস্থা আমার সহ্য হচ্ছে না। অপরদিকে হযরত হাসান বসরী তোমার কাছে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বেটা! তুমি এত খারাপ কেন? হযরত তোমার জানাযা পড়তেও রাজি নয়।

ছেলে যখন একথা শুনল, তখন তার অন্তরে বড় কষ্ট লাগে এবং আক্ষেপ হলো। সে বলতে থাকে, কখন জানি আমার মৃত্যু এসে যায়। তাই আমার একটি অসিয়ত শুনে নিন, আমার অসিয়ত হচ্ছে এই যে, আমার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আপনার উড়না আমার গলায় পেছিয়ে আমার লাশটিকে কুকুরের মত বাড়ির আঙিনায় টানা হেঁচড়া করবেন। মা জিজ্ঞেস করেন, কেন বেটা! ছেলে বলে, মা! তার কারণ হলো, এতে দুনিয়ার মানুষের জানা হয়ে যাবে যে ব্যক্তি তার রব এবং মা বাবার অবাধ্য হয়, তার শেষ পরিণতি এমনই হয়। আমার মা! আপনি আমাকে কবরস্থানে দাফন করবেন না, বরং এ আঙিনাতেই দাফন করে দেবেন। কেননা, আমার গুনাহের করণে কবরস্থানের অন্যান্য মৃতদেরও কষ্ট হবে।

যুবক যখন অসহায় অবস্থায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একথাগুলো বলে, তার এ কথাগুলো মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে ভাল থাকে। এরপর যুবকটির মৃত্যু হয়।

এইমাত্র যুবকটির রূহ বের হয়ে গেল। মা কাঁদছেন, এমন সময় কেউ দরজায় করাঘাত করল। মা ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেন কে? জবাব এলো, আমি হাসান বসরী। মা হতবাক হয়ে বলেন, হযরত! আপনি কিভাবে?

হযরত হাসান বসরী বলেন, দেখুন, আপনি চলে আসার পর আমার ঘুম এসে গিয়েছিল। তখন স্বপ্নে দেখলাম, মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে

বলেছেন, হাসান! তুমি আমার কেমন বন্ধু যে আমার একজন ওলীর জানাযা পড়াতে অস্বীকার করছ? আমি তখনই বুঝে গেলাম যে, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার ছেলের তওবা কবুল করেছেন। আর আমি তখনই আপনার ছেলের জানাযা পড়ার জন্য ছুটে এলাম।

প্রিয় ভাই ও বোন!

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগেও যদি বান্দা তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। তাই আমাদের সবার উচিত। পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সত্য দিলে তওবা করা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে খাস দিলে তওবা করার তওফিক দিন। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দিন। আমীন।

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক্কারী! সাবধান

যে মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে কাউকে শরীক করলো। সে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়স্থানে আল্লাহ্ তায়ালার আযাব গজবের উপযুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে কারীমে বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰىهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

এবং জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নামে এবং জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা, আয়াত ৭২)

শিরিকের পরিচয়

কেউ যদি আল্লাহ্ তায়ালার সমকক্ষ অন্য কিছুকে মনে করে। যেমন– নবী, পীর, বাদশাহ– চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র অথবা অন্য কিছুকে। এসব কিছুকে যদি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ইবাদতে শরিক করে, তাহলে সে কবীরা গুনাহ করছে বলে গণ্য হবে।

শিরককারী কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার কোন অনুকম্পা পাবে না। কেননা সে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ করেছে। তার জন্য কোন সুপারিশকারী থাকবে না। তওবা না করে মারা গেলে ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব।

শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম। সবচেয়ে বড় গুনাহ। হযরত লুকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে নসিহত করেছিলেন, যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

এবং সে সময়ের কথা স্মরণ রাখ– যখন লোকমান নিজ পুত্রকে নসিহত করে বলেছিলেন, হে পুত্র আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শরিক করো না। শিরক হলো শক্ত গুনাহ। (সূরা লুকমান,আয়াত–১৩)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরককে ভয় করতেন এবং শিরককারীকে সতর্ক করেছেন– ধমক দিয়েছেন।

হাদীসে পাকে এরশাদ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের কথা বলব না? এভাবে তিনবার বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামগণ বলেন, হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল! বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে কবীরা গুনাহটি হলো আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করা। পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। রাওয়ী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আধা শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসেন এবং বলেন, খবরদার! মিথ্যা কথাও মিথ্যা সাক্ষ্য এ দুটি থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবে তিনি কথাটি দুবার বলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি) ইবনে হাজার আসকালানী কিতাবুল জাওয়াজীর ৩৪ পৃ.)

আরেক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে জ্বলতে থাকার ব্যাপারে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! যাও এবং মানুষদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দাও, যে নিশ্চয়ই জান্নাতে ঈমান ওয়ালারাই প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ– মুসলিম–তিরমিযী)

প্রিয় ভাই ও বোন!

আসুন শিরিকের ভয়াবহতা থেকে আমরা বেঁচে থাকি। আজ সমাজে কত রকমের শিরক প্রচলিত আছে। অথচ মানুষ এগুলোকে এবাদত মনে করে করছে। আল্লাহ্ মাফ করুন। আজ মানুষ মৃত পীরের মাজারে গিয়ে সিজদা করছে। মাজারে সন্তান কামনা করছে। ধন-সম্পদ চাইছে। মাজারগুলো অধিকাংশই শিরিকে ভরে গেছে। সরলমনা মুসলমান না বুঝে এসবের মধ্যে গিয়ে শিরক করছে। ঈমান আমল নষ্ট করছে। আকীদাগত এ বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ জানেনা। তাদের জানানোর দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের।

মুবাল্লেগদের। যারা দ্বীনের কাজ করছেন, তাদের। মানুষকে বুঝাতে হবে। শিরিকের ভয়াবহতা এর পরিণতি মানুষকে বুঝাতে হবে। নিজে বাঁচলে হবে না। নিজে জানলে হবে না। পথহারা মানুষগুলোকে বুঝাতে হবে। জাহান্নামের আযাব তেকে নিজে বাঁচলে হবে না। মানুষকে বাঁচানোর পথ বলতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের কাজ সহজ করে দিন, আমীন।

সুদখোর! সাবধান

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে হারাম করেছেন, এ ব্যাপারে কোরআনে কারীমে বহু আয়াত এসেছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

অনুবাদঃ যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেভাবেই দাঁড়াবে, যেভাবে দাঁড়ায় সে ঐ ব্যক্তি, যাকে (দুষ্ট) জিন বিকারগ্রস্ততার দ্বারা উদ্ভ্রান্ত করে দিয়েছে। এ অবস্থা এ কারণে হবে যে, তারা বলেছে, ব্যবসাও তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকরা–২৭৫ আয়াত)

সুদ দুনিয়ার জীবনের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেননা সুদ বরকতকে ধ্বংস করে দেয় এবং স্বস্তির বদলে পেরেশানী অর্জন হয়।

হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ এরশাদ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চামড়া কেটে শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী, সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতার প্রতি লানত করেছেন। কুকুর ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তৈরিকারী, অংকনকারীর প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন। (বোখারী ও আবু দাউদ)।

মুসনাদে আহমাদ ও তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম পরিমাণ খাদ্য খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য।

ইমাম হাকেম (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযী.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন জনপদে

সুদ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, তখন সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের উপযুক্ত করে নেয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষের ব্যাপকতা লাভ করে, তারা সর্বদা শত্রুর ভয়ে আতংকগ্রস্ত থাকে এবং বৃষ্টি হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় অভাব অনটনে জর্জরিত থাকে।

মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাযাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে রাতে আমাকে মিরাজ করানো হলো, আমি যখন সে রাতে সপ্তম আকাশে পৌঁছি, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, কেবল বজ্রপাত আর ঘোর অন্ধকার। এরপর একদল লোকের কাছে গেলাম, তাদের পেট ছিল বিশাল ঘরের মত। বাহির থেকে এদের পেটের ভেতর সাপ বিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বলেন, এরা সুদখোর।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, এ উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, পানাহার খেলাধুলা আমোদ ফুর্তি ও দম্ভ অহংকারের সাথে রাত অতিবাহিত করবে। কিন্তু পরক্ষণেই সকালে তারা বিকৃত হয়ে বানর শুকরে রূপান্তরিত হবে। কেউ কেউ মাটিতে ধ্বসে যাবে। কারও কারও উপর পাথর বৃষ্টি হবে। সকালে অন্যান্য লোকেরা বলাবলি করবে, রাতে অমুক লোক মাটিতে দেবে গেছে এবং উমুক বাড়িটি মাটিতে দেবে গেছে। কোন কোন গোত্র ও বাড়ির উপর এমন প্রবলভাবে পাথর বর্ষিত হবে, যেমন কওমে লুতের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, তারা মদপান করতো, রেশমের কাপড় পরিধান করতো। নর্তকীর সাথে রাত কাটাত। সুদ লেনদেন করত। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করত। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রহ.) ও বর্ণনা করেছেন।

মুনাফিক! সাবধান

মুনাফিকের সংজ্ঞা হলো ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফরী করা। দাবী করে মুমিন, কিন্তু কাজ করে এর বিপরীত।

হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চারটি দোষ যে ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। যদিও সে রোযাদার হয়, নামায পড়ে এবং দাবী করে যে সে মুমিন।

(১) যখন কোন কথা বলে, তা মিথ্যা বলে।

(২) যখন ওয়াদা করে, তা খেলাফ করে।

(৩) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তার খেয়ানত করে।

(৪) যখন ঝগড়া করে, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

পরিপূর্ণ মুমিন হলো খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তাওহীদ ও একাত্মবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং দ্বীনের যাবতীয় হুকুম আহকামের উপর পূর্ণ একীন ও তদানুযায়ী আমল করা।

প্রিয় ভাই ও বোন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শাস্তি স্বরূপ দুই জিহ্বা বিশিষ্ট করে উঠাবেন।

আরেক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হলো সেই, যে দ্বিমুখী আচরণ করে। একজনের সাথে বলে একরকম, অপরজনের সাথে সে কথাটিই অন্যরকম করে বলে।

হযরত হুযাইফা (রাযী.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের চেয়ে বর্তমান যুগে মুনাফিকের সংখ্যা অনেক বেশি। সে যুগে তারা নিজেদের মুনাফিকী গোপন করে রাখত। কিন্তু আজকের যুগে নিজেদের নেফাক স্বগর্বে প্রকাশ করে বেড়ায়। বস্তুত, নেফাক জিনিসটি অতি সূক্ষ্ম। বিচক্ষণ মাত্রই তা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী। কারণ, নেফাক সত্যিকার অর্থে ঈমানের বিপরীত?

বিভিন্ন হাদীসসমূহের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নেফাক বা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফর কত সূক্ষ এবং গোপনভাবে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া মোটেই উচিত নয়। হযরত সাহাবায়ে কিরামগণও নিজেদের ব্যাপারে নেফাকের আশংকা করতেন। তারা ভীত থাকতেন, কোন কারণে তাদের নাম মুনাফিকের খাতায় উঠে যায় কিনা?

হযরত উমর (রাযী.) অনেক সময় হযরত হুযাইফা (রাযী.) কে জিজ্ঞেস করতেন, মুনাফিকদের মধ্যে আমার নামতো উঠে যায়নি? অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তিনি নেফাকের আশংকা করতেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন।

হযরত হুযাইফা (রাযী.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কেউ এমন কোন কথা বলে বসত। যে কথার কারণে সে মুনাফিক হয়ে

যেত এবং এ এর উপর মৃত্যুবরণ করত। আর এ যুগে সে ধরনের কথা আমি তোমাদের মুখে দশ দশবার উচ্চারিত হতে শুনি। অথচ তোমাদের কোন উৎকণ্ঠা নেই, পরোয়া নেই।

হযরত হুযাইফার (রাযী.) এর কাছে এক ব্যক্তি বললো, আমার আশংকা হয় যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা? হযরত হুযাইফা (রাযী.) বলেন, তুমি যদি নিজ সম্পর্কে মুনাফিকীর আশংকা বোধ না করতে, তাহলে সত্যিই তুমি মুনাফিক হয়ে যেতে।

তাবেয়ী হযরত ইবনে আবী মূলাইকা (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একশত ত্রিশজন সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে নেফাকের আশংকা করেছেন। ইবনে আবী মুলাইকা বলেন, এ ছিল হযরত সাহাবায়ে কিরামগণের আল্লাহ্-ভীতি ও অতি উচ্চ পর্যায়ের ঈমানী চেতনা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে পূর্ণ মুমিন হিসেবে কবুল করুন। নেফাক থেকে আমাদের অন্তরকে হেফাযত করুন। আমীন।

আসুন গুনাহ ছেড়ে তওবা করি

প্রিয় ভাই বোনেরা, আসুন আমরা তওবা করি। সময় নেই। এভাবে অবহেলা করে মূল্যবান সময়গুলো আর কত নষ্ট করব! বছর তো আরেকটি চলে গেলো। আসুন, আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাই। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নিজের গুনাহের জন্য তওবা করি। কাঁদি, দু এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলি। এ জমিনতো আমরা নাফরমানীতে ভরে ফেলেছি। আমরা নাফরমানিতে এ জমিন জ্বালিয়ে ফেলেছি। এখন আমাদের চোখের দু ফোটা পানি এ জমিনকে ঠাণ্ডা করতে পারে।

আমরা গুনাহ করি। ভুলে যাই পরিণতির কথা। ভাবিনা প্রতি সেকেন্ডের হিসাবের জন্য আমায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। হাশরের ময়দানে নিশ্চয়ই মহান রাব্বুল আলামীন আমার আমলনামা খুলবেন। এক এক দিনের হিসাব সামনে আসবে। সপ্তাহের হিসাব সামনে আসবে। মাস বছর সব হিসাব দিতে হবে। আমার পরীক্ষার খাতা খুলবেন আল্লাহ্ তায়ালা। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, দেখো বান্দা! এসব তুমি দুনিয়াতে কামাই করেছো। দুনিয়ার সুখের জন্য অন্তরের চাহিদা মিটানোর জন্য এগুলো তুমি অর্জন করেছো। বান্দা! এটা তুমি কি করেছো?

আমাদের কিছুই বলার থাকবে না। কারণ দুদিনের দুনিয়ার জন্য আমরা চরম অবাধ্যতা করছি। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম আহকামের বিরোধীতা করছি। আমরাতো আল্লাহ্ তায়ালার সামনে লজ্জিত হওয়ার মত কাজই করছি।

তা হাজেরানে মজলিস। যা করার করেছেন, এখন থেকে আসুন আমরা সবাই তওবা করি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে রাজি ও খুশি করা ছাড়া উম্মতের আর কোন কাজ থাকতে পারেনা। এর চেয়ে বড় কোন দাওয়াত উম্মতের সামনে নেই। এর চেয়ে বড় নেকীর কাজ উম্মতের সামনে আর কিছু নেই। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নিজেকে কোরবান করা আল্লাহ্ তায়ালার পথে নিজেকে স্বপে দেয়া ছাড়া উম্মতের সামনে আর কোন মাকছাদ নেই। আল্লাহ্ তায়ালার ঘর মসজিদকে ভুলে যাওয়া, দাওয়াত ছেড়ে দেয়া, সেই আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাদেরকে হাতজোড় করে বুঝানো আমাদের দায়িত্ব। দুনিয়াতে মুসলমানের সামনে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ কোন কালেই ছিল না।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আজ আমরা যে গুনাহের পাহাড় গড়ে তুলেছি, আজ যে আগুন আমি আমার গুনাহের মাধ্যমে প্রজ্জ্বলিত করেছি। এ আগুনতো সাত সমুদ্র পানি দিয়েও নিভানো যাবেনা। আজ আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পাপের জন্য ক্রন্দনকারী খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়া যায় না গুনাহের ভয়ে ভীত কোন মানুষকে। যে কেঁদে কেঁদে পাগলের মত মাটিতে গড়াগড়ি খায়।

আমরা ক্ষুধার্ত হই। খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাই। আল্লাহ্ তায়ালার কসম! এর চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত আজ আমাদের হওয়া উচিত ছিল হিদায়েতের জন্য। আজ আমরা হিদায়েতের জন্য তৃষ্ণার্ত। আজ আমরা হিদায়েতের জন্য বেকারার। আসুন, কাঁদি, মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লজ্জিত হই, অশ্রু ঝরাই। বলাতো যায় না, আল্লাহ্ পাক কার অশ্রু কবুল করে নেন।

বসে থাকার সময় নেই। অলসতার সময় নেই, বেরিয়ে পড় আল্লাহ্ তায়ালার পথে। আমরা যদি প্রচারের কাজে গাফলতী করি, তাহলে আমরা বরবাদ হয়ে যাব। যে কাজের জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি, যে কাজের জন্য এ উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। সে কাজের জন্য তো আমাদের জান-মাল সব কোরবান করে দেয়া উচিত ছিল। ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরা উচিত ছিল। ভাই দাওয়াত পৌছানোতো আমাদের কাজ। কবুল করার মালিক তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

যখন কোন কওম আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যায়, তাদের অবস্থাতো পথ হারা সে মুসাফিরের মত। যে আধার রাতে অচেনা জঙ্গলে গন্তব্যহীন ছুটছে, সে মুসাফির জানেনা তার মনজিল কত দূর? আধার রাতে গাছের সাথে ঠোকর খায়। পাথরের সাথে ঠোকর খায়। হোচট খেতে খেতে একসময় নিজে সেখানেই মরে পড়ে থাকে।

যখন উম্মতের সম্পর্ক আল্লাহ্ তায়ালার সাথে দুর্বল হয়ে যায়। যখন উম্মতের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দুর্বল হয়ে যায়। তখন সে কওম শয়তানের অনুগত হয়ে যায়। আর শয়তানের অনুগত করে কেউ সফল হতে পারেনা। যদিও হয়, তাহলে তা সাময়িক। তা ধোঁকা। আজ যারা আল্লাহ্ তায়ালাকে ছেড়ে শয়তানের সাথে সখ্যতা গড়েছো! তোমরা বলো তো, তোমরা কার অনুগত কর? তোমরা কাকে সৃষ্টিকর্তা মানো? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী মান কি?

তো ভাই ও বোনেরা আমার!

তোমরা হুশে এসো। তোমরা আজ আল্লাহ্ তায়ালাকে ছেড়ে যাচ্ছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভুলে গেছো। ভুলে গেছো গন্তব্য। ছুটে চলেছো জাহান্নামের দিকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন আগুন জ্বালিয়েছে, চারদিক থেকে পতঙ্গ সে আগুনের দিকে আসছে, পতঙ্গের তো ধারণা নেই যে, এ আগুনে তারা জ্বলে যাবে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পতঙ্গের যদি আগুনে পুড়ে যাবার ধারণা থাকত, তাহলে পাগলপারা হয়ে উড়ে উড়ে আগুনে ঝাপ দিত না।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সুন্দর একটি উদাহারণ দিয়ে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন। যে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর আমরা পতঙ্গের মত তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি। তিনি আমাদের হিদায়েতের দিকে ডেকেছেন, সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন, সত্য পথ নিয়ে এসেছেন। মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন। এরপরও আমরা জাহান্নামের দিকেই ছুটে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মসজিদে নববীতে প্রথম খুতবায় বলেছিলেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। সব গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাও। বেশি বেশি নেক আমল করো, যা তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। সমস্ত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, কেননা, এ গুনাহ তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরাতো জান্নাত জাহান্নামের কথা চিন্তা করি না। আমরা এত ব্যস্ত যে, এসব চিন্তা করার সময়ই পাই না। আজ আমরা জান্নাতের খবর রাখিনা, জাহান্নামের খবর রাখিনা। আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করে জীবন ভরে ফেলেছি। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ বাদ দিয়ে বিধর্মীদের অনুসরণ করছি।

আমারতো ক্ষমতা এতটুকুই যে আপনাদের কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে দেয়া। কিন্তু অন্তরে প্রভাব সৃষ্টির মালিকতো আমি নই। অন্তরে তো মহান রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতা চলে।

আরে ভাই! মুসলমান কি কভু আখিরাতকে অবহেলা করতে পারে? হযরত আলী (রাযী.) নিজ সন্তান, হযরত হাসান, হোসাইন (রাযী.) কে নসিহত করেছিলেন। কখনও যদি দুনিয়াও আখিরাত সামনে আসে, তখন আখিরাতকে প্রাধান্য দেবে। আখিরাতকে ছাড়বে না। দুনিয়া ছেড়ে দেবে। কারণ আখিরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়া তোমার হাত থেকে চলে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাই। আমিতো বলি, আমার এ অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার জিকিরে মশগুল রাখি। অন্তর থেকে নাফরমানী দূর করে দেই। নাচ-গানতো আমাদের তাহযীব নয়। আমরাতো আল্লাহ্ তায়ালার গোলাম। আমরা আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলামীর উপর চলব। যখন মৃত্যু আসবে, এ আনুগত্যের উপরই মরব।

বেকার জীবন

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

মৃত্যু আমাদের অতি কাছে জেনেও আমরা লাগামহীন জিন্দেগী পার করছি। মৃত স্বজনকে কাঁধে করে দাফন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। এ থেকেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি না। ভাবিনা, এ দুনিয়া আমার চিরস্থায়ী আবাস নয়। ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মিটে যাবে দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক। এ দুনিয়ার ধোঁকায় যে পড়েছে, দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আখিরাতকে বরবাদ করেছে, সে বাজিতে হেরে গেছে।

আজ আমরা আজান শুনে ঘরে বসে থাকি। নামায পড়ি না। মসজিদে যাই না। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া এ শরীর আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর নাফরমানিতে ব্যবহার করছি। নাচ-গানে মধ্যমণি হয়ে গেছি

মনে রেখো, একদিন সব নেশা ছুটে যাবে। সব রঙীন স্বপ্ন একদিন ভেঙে চূরমার হয়ে যাবে। সব মজা শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর থাবা আমাদের সব নেশা ছুটিয়ে দেবে।

ভুলে গেছো কবরের অন্ধকারের কথা?

ভুলে গেছো কবরের তীব্র উত্তাপ, সাপ, বিচ্ছু!

ভুলে গেছো জান্নাতের নিয়ামত রাজির কথা? মন কি চায় না জান্নাতে মহান রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভ করতে?

সব কি ভুলে গেছো?

আল্লাহ্ তায়ালার কালাম, আল্লাহ্ পাকের জিকির? নামায, রোযা-জাকাত? হজ্ব? কালেমাও কি ভুলে গেছো?

যদি এমন হয়, তাহলে আমাকে বলো তো তুমি কেমন মুসলমান?

আরে! বিরান হয়ে যাওয়া পাথর হৃদয়ের মানুষ! এ অল্পদিনের দুনিয়া কামানোর জন্য সব ভুলে গেলে? একবার কি ভেবেছো নিজের পরিণতির কথা? ভেবেছো সেদিনের কথা, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

হে আমার বান্দা! আমার অবাধ্য হওয়ার পূর্বে ভেবে নাও, আমার আযাবের ভয়াবহতা সহ্য করার ক্ষমতা তোমার দেহের আছে কিনা? তোমাদের এ ক্ষমতা নেই যে, আমার ক্রোধকে সহ্য করবে! গান শোনার আগে ভেবে নাও, এ কানে জাহান্নামের তীব্র গরম গলিত সীসা ঢালা হবে। বেগানা নারীর প্রতি নজর দেয়ার পূর্বে ভেবে নাও, এ চোখে জাহান্নামের কয়লা ভরে দেয়া হবে।

সুদ খাওয়ার পূর্বে ভেবে নাও, তোমার পেটে সাপ বিচ্ছু ভরে দেয়া হবে। সে সাপ তোমার পেটের ভেতর দংশন করতে থাকবে। এ সাপ যদি শরীরের কোথাও দংশন করে, তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, বান্দা! আমার অবাধ্য হওয়ার পূর্বে ভেবে দেখো যে, তোমাকে আমার কাছেই আসতে হবে। কোরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

তাকে বলে দিন, যে আমি গাফেল নই, কার থেকে? অবাধ্যদের থেকে।

তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা পাকড়াও করছেন না কেন? কোরআনে পাকে বলা হচ্ছে,

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

আমি তাদের সুযোগ দিচ্ছি। মৃত্যু পর্যন্ত সুযোগ আছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাই। আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাতে পারলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। আমাদের জিন্দেগী সুন্দর হবে। আর আল্লাহ্ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। দুনিয়ার সুখ কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্ দেন। এটা কাফেরদেরও দেন। মুসলমানদেরও দেন। কিন্তু মৃত্যুর পর যে বিপদ, তা বরদাশত করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

প্রিয় বোন তোমাকে বলছি!

আজ এ মাহফিলে উপস্থিত হাজার হাজার নারী। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, দ্বীনী আলোচনা শোনার জন্য। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে আপনাদের আবেগ সমুদ্রে ঢেউ তুলে ফেলব। আপনাদের চোখে বেদনার অশ্রুর প্লাবন বয়ে যাবে। এরপর আমি বলে যাব, আপনারাও চোখের পানি উড়নার আঁচলে মুছে বাড়ি চলে যাবেন। এরপর আপনাদের অন্তর থেকেও চোখের পানির মত মুছে যাবে আমার নসিহতগুলো। কেন এমন হয়? আপনাদের বিবেক ও চেতনার দুয়ার খুলে দিতে আমি চেষ্টা করি। আপনারা এখান থেকে উঠে যাবার পরেই সে দুয়ার আবার বন্ধ হয়ে যায়।

হে মুসলিম নারী! কি লাভ হবে? আমি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে গেলাম। আপনারা বেদনায় অশ্রুপাত করে বন্যা বইয়ে দেন। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সব ভুলে যান। মনে রাখবেন, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে পাকের এ কথাগুলোকে জিন্দেগীতে আমলে পরিণত করুন। দেখবেন মুক্তি মিলবে। জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। নিজেকে সার্থক মনে হবে। মা ও বোনেরা! নিজেদের মর্যাদা বুঝুন। ইসলাম আপনাদের কত সম্মান দিয়েছে। আপনি নিজেকে চিনেন। আপনি তো সুরক্ষিত মুক্তা। সংরক্ষিত জহরত। ইসলাম আপনাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

হে মুসলিম তরুণী! কি করে তুমি ভেসে যাচ্ছো বিজাতীয় কালচারের জোয়ারে। পর্দার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছো? কি করে তুমি কাফের মুশরিকদের আচার আচরণকে আপন করে নিলে?

আশ্চর্য! কি করে তুমি তাদের খেলার পুতুল হলে। বলোতো! নারী স্বাধীনতার নামে তোমার মর্যাদাকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এ স্বাধীনতার

নামে তুমি আজ সুন্দর পোশাক পড়ে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে শত শত পুরুষের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করছো। হয়ে যাচ্ছো পর পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির শিকার।

সমান অধিকারের নামে নেমেছো পুরুষের সাথে প্রতিযোগীতায়। আর এতে ক্ষতিতো তোমারই হচ্ছে, তোমার এ স্বাধীনতার সুযোগ নিচ্ছে সমাজের কিছু মতলববাজ কামুক পুরুষ। হে নারী! তুমি ঠকছো। নিজের মর্যাদাকে বরবাদ করছো। স্বাধীনতার কথা বলে পর্দাহীন হয়ে নিজেকে ছোট করছো।

মনে রেখো, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানীর মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই। আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ও তার হুকুম পালনেই তুমি পাবে প্রকৃত সৌন্দর্য, শান্তি স্বস্তি। আর তোমার আনুগত্যের পুরস্কার আল্লাহ্ তোমাকে দেবেন পরকালে, জান্নাতে। দুনিয়ার সৌন্দর্যের সাথে যার কোন তুলনা চলে না। সে সীমাহীন সৌন্দর্য দেখবে, উপভোগ করবে।

জান্নাতী হুরদের সাথে তোমার কোথাও মিল আছে, তুমি কি ভাব সে কথা! কল্পনাও করো না হয়ত। জানতে যদি চেষ্টা করতে। যদি জানতে তোমার মর্যাদা। যদি বুঝতে তোমার মূল্য! বলছি শোন।

জান্নাতী হুরদের যদিও রাত জেগে ইবাদত করতে হয় না। তাদের কোন প্রবৃত্তির তাড়না নেই। যৌবনে উন্মাদনা নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এমন করেই তৈরি করেছেন। এবার তুমি নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করো। কত নির্ঘুম রাত তুমি কাটিয়েছো আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কত অশ্রুসজল প্রার্থনা করেছো। ডেকেছো কাতর স্বরে। শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তুমি ত্যাগ করেছো কত আরাম আয়েশ ভোগ বিলাস। শয়তান তোমাকে ডেকেছে খারাপ কাজের দিকে বার বার। প্রতিবারই তুমি নিজেকে সংযত করেছো। নিজের কামনা, বাসনাকে সংবরন করেছো। আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে নিজেকে সরিয়ে রেখেছো সব মন্দ কাজ থেকে। এখন তুমি চিন্তা করে দেখো, তুমি সাধনায় সংযমে জান্নাতের হুরকেও হার মানিয়েছো।

হুরদের তো প্রবৃত্তিই নেই। সাধ আহ্লাদই নেই। তাহলে প্রবৃত্তির তাড়না আসবে কোথা থেকে? তোমার প্রবৃত্তি ছিল, যৌবনের উন্মাদনা ছিল, তার আকর্ষণীয় আবেদন ছিল। ফাঁদ ছিল। তবুও তুমি সে পথে পা বাড়াও নি। তাহলে তো তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমিই তো সুন্দর।

প্রিয় বোনেরা! তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবো। নিজের পবিত্রতার কথা ভাবো। মুসলিম নারীরা কত সম্মানিত ছিল। দ্বীনের জন্য যে সব মুসলিম নারীরা নিজ সন্তানকে, নিজ স্বামীকে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছেন। তাদের কথা ভাব। তারাও তোমার মত নারীই ছিলেন। তাদেরও তো স্বাধ

আহ্লাদ ছিল। মায়া মুহাব্বত অন্তরে ছিল। কিন্তু তাদের কাছে সবার আগে ছিল ঈমান। আজ তোমাদের কি হলো? তোমরা শুধু ভাব সুন্দর পোশাক আর গহনা নিয়ে। তোমাদের সময় চলে যায় কেশ বিন্যাস করতে করতে। দুনিয়াবী সুখ শান্তির আশায় সাধ আহ্লাদপূর্ণ করতে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছ। রূপ, যৌবনের অহংকারে তুমি পরিণাম ভুলে গেছ। এ রূপ যৌবন মাঠে ময়দানে ফেরী করে বেড়াচ্ছো। নিজে তো গুনাহের সমুদ্রে ডুবছই, সাথে আরও হাজার হাজার মানুষকেও গুনাহের দিকে টেনে নিয়েছো।

প্রিয় বোন! তোমার সামনে দুটি পথ। যে কোন একটি পথ তুমি গ্রহণ করতে পার। প্রথম হলো পর্দার পথ। এ পথ তোমাকে দিবে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি। এ পথ তোমাকে দিবে দুনিয়ার জিন্দেগীতে ইজ্জত। আর দ্বিতীয় পথ বেপর্দা বেহায়াপনার। এ পথ তোমাকে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করবে। আর পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আখিরাতের সে কঠিন দিবসে নিজেকে বাঁচাতে হলে তওবা করো। ফিরে এসো জান্নাতের পথে। আসুন আমরা সবাই আযাব ও গজব থেকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পানাহ চাই। আমীন।

মুসলিম নারীর ইজ্জত

ইসলাম নারীকে এত বেশি সম্মান দিয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মদীনায় এক নারীর বেইজ্জতির কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

ইহুদীরা বাস করতো মদীনায়। মদীনায় মুসলমানদের হিযরত করাকে ইহুদীরা মেনে নিতে পারেনি। সর্বক্ষণ মদীনার মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা তারা করতো। বিশেষ করে হিযাবের আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন ইহুদীরা মুসলিম মহিলাদের হিজাব পড়া দেখলেই ঠাট্টা মশকরা করতো। বিভিন্নভাবে তারা মুসলিম মহিলাদের বুঝিয়ে লোভ দেখিয়ে বিপথগামী করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু যে হৃদয়ে একবার ঈমানের নূর প্রবেশ করেছে। সে হৃদয় কি বজ্জাত ইহুদীদের ফাঁদে পা দিবে? ইহুদীরা এ মিশনে ব্যর্থ হয়ে এখন শুরু করলো মুসলিম নারীদের বেইজ্জতী করা।

একদিন এক মুসলিম মহিলা বিশেষ প্রয়োজনে বনু কায়নুকার বাজারে এলেন। মহিলা এক স্বর্ণের দোকানে বসেন। মহিলা হিজাবে ঢাকা ছিলেন। এদিকে বজ্জাত ইহুদীরা হিজাব পড়া এ মহিলাকে দেখে তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে

তাকাতে থাকে। তার চেহারা দেখার জন্য আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। তাকে অপমান করার জন্য ফন্দি ফিকির করতে থাকে। বর্বর যুগে ইহুদীরা নারীদের সাথে এমন আচরণই করতো। নারীকে নিয়ে হাসি তামাশা, জোর করে তার শরীর স্পর্শ করা, নারীকে বেইজ্জতী করা ইহুদীদের স্বভাব ছিল।

ইহুদীরা সে মহিলার চেহারা উন্মুক্ত করতে বলে। কিন্তু মুসলিম নারী ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে ইহুদী স্বর্ণকার নারীটির অসতর্কতায় তার পরনের কাপড়টির নিচের অংশ পিঠের উড়নার সাথে বেঁধে ফেলে।

মহিলাটি যখন দাঁড়াতে যান, পিছন দিক থেকে তার সতর উন্মুক্ত হয়ে গেল। উপস্থিত ইহুদীরা তখন উল্লাস করতে থাকে।

মহিলাটি এ অবস্থায় অসহায় হয়ে চিৎকার করতে থাকে। আর বলতে থাকে, হায়! ওরা যদি আমার সতর অনাবৃত না করে আমাকে মেরে ফেলত।

এক মুসলিম যুবক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সহ্য করতে পারল না। সে তলোয়ার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইহুদী স্বর্ণকারের উপর এবং সে স্বর্ণকারকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। সেখানে উপস্থিত ইহুদীরা মুসলমান যুবকটিকে হত্যা করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা জানতে পারেন, ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এ ঘটনায় চুক্তি ভেঙ্গে যায়। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম ক্ষুব্ধ হলেন। বিশেষ করে নারীর সাথে ইহুদীদের এ হীন আচরণ আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন না। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বনু কায়নুকার ইহুদীদের বস্তি অবরোধ করার নির্দেশ দেন। অবরোধ আরোপিত হলো। কয়েক দিনেই ইহুদীরা বিপদ বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করল।

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর প্রতি বেইজ্জতির সাজা দেয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু বাদ সাধল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই, সে ছিল ইহুদীদের মাথা।

উবাই বলে, মুহাম্মদ! আমার ইহুদী বন্ধুদের প্রতি সদাচারণ করুন।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় কর্ণপাত করেন না। যারা মুমিনদের ভেতর অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, তাদেরকে ক্ষমা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কঠোর মনোভাব দেখে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই আবারও বলে,

মুহাম্মদ! আমার বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করুন।

আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুপারিশকে গ্রাহ্য করেননি। নারীর সম্ভ্রমকে রক্ষার স্বার্থে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এতে শয়তান ইবনে উবাই দিশেহারা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হতে হবে। সদয় হতে হবে।

তার এ আচরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ছাড়ো আমাকে।

কিন্তু মুনাফিকটা বারবার এমন করতে থাকে। ইহুদীদের কতল না করার অনুরোধ করতে থাকে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে বলেন, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নেয়া হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের কতল করলেন না। কিন্তু মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন।

হযরত উম্মে শুরাইক, এক মহিলা সাহাবিয়্যাহ

উম্মে শুরাইক রাযীয়াল্লাহু আনহা ইসলাম কবুল করেছিলেন প্রথম সময়ে। মক্কা নগরীতে বসে। মক্কা নগরীতে তখন কাফেরদের দাপট ছিল সীমাহীন। হাতে গোনা ক'জন মুসলমান কাফেরদের নির্মমতায় অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিন তিনি দেখেন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের নির্যাতন করছে, তিনি দেখেন। হযরত বেলালকে একদল কাফের উত্তপ্ত মরুভূমিতে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আরেক স্থানে হযরত সুমাইয়াকে নির্যাতন করা হচ্ছে, তিনি দেখেন খাব্বাব, আম্মার, ইয়াসীর, খুবায়েব সহ আরও নও মুসলিমদের উপর অমানুষিক নির্যাতন। তিনি একদিন শোনলেন হযরত সুমাইয়াকে আবু জাহেল শহীদ করে দিয়েছে। উম্মে শুরাইক মুসলমানদের এ দুর্বলতা অসহায়ত্ব সহ্য করতে পারেন না। নিজের প্রতি চরম ঝুঁকি নিয়ে দাওয়াতী কাজের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। এসব বাঁধা নির্মমতা দেখে আরও জাগ্রত হল তার ঈমানী চেতনা।

তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের মর্যাদা হয়ে উঠে সবচেয়ে মূল্যবান।

তিনি গোপনে শুরু করেন নারীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত। মূর্তি পুজার অসাড়তা তুলে ধরে মহিলাদের বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু তার এ গোপন দাওয়াতি কাজ বেশি দিন গোপন থাকে না। মক্কার কাফেরদের কাছে তা প্রকাশ

হয়ে পড়ে। ফলে তারা ক্ষেপে যায়। উম্মে শুরাইক কোরাইশ গোত্রের ছিলেন না। কিন্তু কোরাইশদের এক মিত্র গোত্রের ছিলেন।

কোরাইশরা তাকে ধরে এনে বলে, উম্মে শুরাইক! তোমার সাহস তো কম না। তুমি আমাদের শত্রুর ধর্ম গ্রহণ করেছো। আবার তা প্রচারও করছো! তোমার গোত্র যদি আমাদের মিত্র না হতো তাহলে তোমাকে কতল করতাম। কিন্তু তার পরও তোমাকে আমরা একেবারে ছেড়ে দেব না। তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে। মক্কায় তুমি থাকতে পারবে না।

কাফেররা উম্মে শুরাইককে একটি উটের পিঠে তুলে দিল। শুরু হলো উত্তপ্ত মরুভূমিতে উম্মে শুরাইকের কঠিন সফর। কাফেররা তার সাথে তিনজন লোক দিল, তাকে পাহারা দেয়ার জন্য। তিনদিন তারা উম্মে শুরাইককে নিয়ে পথ চলল, এ তিনদিন তাকে কিছুই খেতে দেয় নি। এক ফোঁটা পানিও না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় উম্মে শুরাইকের প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

কাফেলা যখন কোথাও যাত্রা বিরতি দিত, তখন তাকে বেধে রাখা হতো। উম্মে শুরাইককে বেঁধে রৌদ্রে ফেলে তিনজন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত।

একদিন উম্মে শুরাইককে রৌদ্রে ফেলে তিনজন বিশ্রাম করছে। উম্মে শুরাইক তাদের কাছে পানি চাইলেন। তারা না বলে দিল। ক্ষুধা ও পিপাসার তীব্র যন্ত্রণায় তিনি অস্থির। জিহ্বা চাটতে লাগলেন। কিন্তু তিন চারদিনের অভুক্ত যে মানুষটি, তার জিহ্বায় রস আসবে কোথা থেকে। তাও জিহ্বা চাটছেন, আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত কামনা করছেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন, বুকের কাছটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হাত দিয়ে দেখেন পানি ভরা একটি ছোট বালতি। তিনি খুব একটা বিস্মিতও হলেন না। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের প্রতি পূর্ব থেকেই তার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়।

তিনি হাত দিয়ে একটু একটু করে পানি নিয়ে পান করতে লাগলেন। তৃপ্তি ভরে পানি পান করে আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। কি শীতল সে পানি! কি মিষ্টতা সে পানির! তার ভেতরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর বাকি পানিটুকু শরীরে ঢেলে দেন। আহা! কি শান্তি, যেন জান্নাতী নহর থেকে এইমাত্র তিনি নেয়ে উঠলেন।

এদিকে কাফের তিনজন বিশ্রাম শেষে রওয়ানা হওয়ার জন্য উঠে উম্মে শুরাইকের কাছে এলো। তারা তো হতবাক! তার শরীর কাপড় সব পানিতে ভেজা। তাকে দেখেও মনে হলো ক্লান্তিহীন, সতেজ, হৃষ্টপুষ্ট। তারা ভেবে পাচ্ছেনা এ পানি সে কোথা থেকে পেল? তার পা তো বাঁধা। কেউ কি পানি দিয়ে গেল একে? সেতো যাবার প্রশ্নই আসেনা।

তারা জিজ্ঞেস করল, এই ঠিক করে বলো তো, তুমি পায়ের বাঁধন খুলে আমাদের পানিতো এনে শেষ করে দাওনি?

উম্মে শুরাইক বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার কসম! আপনাদের পানির কাছেও যাইনি।

তারা তাদের পানির মশকগুলো দেখল, তাতো পানিতে ভরাই আছে। তাহলে? বিস্ময় যেন তাদের কাটছে না। তারা আবার জিজ্ঞেস করল। সত্যি করে বল, পানি কোথা থেকে পেলে?

উম্মে শোরাইক জবাব দেন। আমি যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান এনেছি, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ আমাকে পান করিয়েছেন। আকাশ থেকে একটি বালতি ভরা পানি আমার কাছে এসেছে, আমি তা থেকেই তৃপ্ত সহকারে পান করেছি। শরীরে ঢেলেছি।

কাফেররা একথা শুনে বিস্ময়ে একে অপরের দিকে চাওয়া-চাওয়ী করতে থাকে। আর বলে, তার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো তার দ্বীনই শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। এরপর তিনজন উম্মে শুরাইকের কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। আর খুলে দিল উম্মে শুরাইকের বাঁধন। মুহূর্তে বদলে যায় তাদের তিনজন। কঠিন হৃদয়ের পাহারাদার থেকে হয়ে যায় দয়ালু ও অনুগত খাদেম।

প্রিয় বোন!

এরা হলো আমাদের গর্ব। যারা অন্যায় অসত্যের কাছে কখনও মাথানত করেনি। তারা আপোষ করেননি। জান দিয়েছেন, তবুও দ্বীনের পথে অটুট ছিলেন। নির্যাতন সয়েছেন, কিন্তু নতি স্বীকার করেন নি। গরম লোহার ছ্যাকা খেয়েছেন। স্বামী সন্তানদের বিচ্ছেদ সয়েছেন, তবুও পবিত্র বিশ্বাস থেকে তিল পরিমাণও বিচ্যুত হননি।

আরেক নারীর ঈমান দীপ্ত জীবন কথা

তার উপনাম উম্মে সুলাইম।

গোমাইসা বিনতে মালহান। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযী.) এর মা। যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خشفة بَيْنَ يَدَىَّ فَإِذَا هِيَ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে শুনতে পেলাম– আমার সামনে এক খাসসানী। চেয়ে দেখি, আরে এ যে গোমাইসা বিনতে মালহান।

এক বিস্ময়কর নারী। জাহেলী যুগে অন্যান্য নারীদের মতই কেটেছে তার জীবন। মালিক ইবনে নজরের সাথে তার বিয়ে হয়।[১] ইসলামের প্রথম যুগে আনসারদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে তিনিও ইসলাম কবুল করেন। তিনি ইসলাম কবুল করার পর তার স্বামী মালিক ইবনে নজরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু স্বামী এ দাওয়াত কবুল তো করেইনি উল্টো তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে সিরিয়ায় (শামে) চলে যায়। উম্মে সুলাইমকেও নিতে চেয়েছিল, কিন্তু যাননি। স্বামী একাই চলে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

উম্মে সুলাইম একজন রূপবতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ করার জন্য বহু প্রস্তাব আসে। আবু তালহা ও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবু তালহা তখনও মুসলমান হননি। উম্মে সুলাইম আবু তালহার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেননি। তবে শর্ত দিয়ে বলেন, আবু তালহা! তোমার মত মানুষকে ফিরাই কি করে? আমি মুসলিম আর তুমি কাফের। তুমি যদি ইসলাম কবুল করো– তাহলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। হা, তোমাকে কোন দেনমোহর দিতে হবে না। বরং তোমার ইসলাম গ্রহণই আমার মোহর হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবু তালহা বলেন, কিন্তু আমিওতো একটি ধর্মের অনুসারী। উম্মে সুলাইম বলেন, আবু তালহা! তুমিও একটি ধর্মের অনুসারী। কিন্তু তা বাতিল ধর্ম। তুমি বলো তো, তুমি যেগুলোর পুজা করছো, তা নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরো ছাড়া আর কিছু? যা তোমার হাবশী গোলাম কেটে কেটে তৈরি করেছে?

আবু তালহা উম্মে সুলাইমের একথায় যুক্তি খুঁজে পেলেন। বলেন হে তোমার কথাই ঠিক। উম্মে সুলাইম বুঝতে পারেন, কথায় পাথর গলছে।

আবার বলেন, আবু তালহা! তোমার বিবেকে কি এ প্রশ্ন জাগেনা যে, এমন নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরাকে নিজের দেবতা মানতে?

শোন আবু তালহা! ইসলাম কবুল করলেই কেবল আমি বিয়েতে রাজি। মোহর ছাড়াই বিয়েতে রাজি। তোমার ইসলাম গ্রহণই হবে আমার মোহর।

আবু তালহা এসব কথায় লাজাওয়াব হয়ে যান। বলেন, আমি একটু ভেবে দেখি। এ বলে আবু তালহা চলে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল।

---

[১] এ স্বামীর ঘরেই সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক (রাযী.) এর জন্ম হয়।

এ ঘোষণায় উম্মে সুলাইম ভীষণ খুশি হন। এরপর উম্মে সুলাইম তার ছেলে, হযরত আনাস বিন মালেককে বলেন, আমাকে আবু তালহার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও।

বিবাহ হয়ে যায়। দু'জনই খুশি। বিবাহের জন্য যতটা না খুশি, তার চেয়ে বেশি খুশি ঈমান নসিব হওয়ায়। হযরত উম্মে সুলাইম আবু তালহার ঈমানের বদৌলতে নিজের অধিকার, নিজের প্রাপ্য দেনমোহর ছেড়ে দেন। নিজের স্বার্থের চেয়ে ইসলামের স্বার্থকে বড় করে দেখেন।

এর চেয়ে মূল্যবান মোহর আর কি হতে পারে? টাকা নয়, অলংকার নয়, ইসলাম তার মোহর। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

হযরত উম্মে সুলাইম ছিলেন এমন এক মহিয়সী নারী, আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজি ও খুশি যার একমাত্র ব্রত ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিযরত করে এলেন, তখন আনসারগণ আল্লাহ্ তায়ালার নবীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে মেহমান হওয়ার পর আনসারগণ দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। অন্য সবার মত তিনিও সাক্ষাতের জন্য এলেন। তার মন চাইলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে কিছু পেশ করতে। সাথে কিছু নিয়েও যাননি। একমাত্র সন্তান আনাস তার সাথেই ছিলেন। উম্মে সুলাইম ছেলে আনাসকে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন,

হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল! আমার ছেলে আনাস এখন থেকে সব সময় আপনার খিদমতে থাকবে। আপনার সেবা করবে। এরপর তিনি খুশি মনে বাড়ি চলে যান।

সেদিন থেকে আনাস বিন মালেক (রাযী.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে থেকে যান এবং সকাল সন্ধ্যার খাদেম হয়ে যান।

আল্লাহ্ ও তার রাসূলের জন্য কি ত্যাগ। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের বদলে ছেড়ে দেন, নারীর বিশেষ অধিকার, মোহর। আর আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসায় ছেড়ে দেন সন্তানের অধিকার।

উম্মে সুলাইম ছিলেন একজন আলোকিত নারী। আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত আর স্বামীর খিদমত ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। আজ দেখা যায় অনেক নারী নামায রোযা করছে, ইবাদত বন্দেগীতে অনেক এগিয়ে– কিন্তু স্বামীর

আনুগত্যকে এবং স্বামীর মনতুষ্টিকে দরকারী মনে করে না। তাদের জন্য উম্মে সুলাইমের এ ঘটনা শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে আশা রাখি।

বিয়ের পর উম্মে সুলাইম আর আবু তালহার দাম্পত্য জীবন সুখে শান্তিতে চলছে। কিছুদিন পর তাদের ঘর আলো করে জন্ম নিল একটি পুত্র সন্তান। নাম রাখা হলো আবু উমায়ের। আবু তালহা ছেলেকে খুব ভাল বাসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাকে খুব ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেন, উমায়ের একটি ছোট্ট পাখি নিয়ে খেলা করছে। পাখিটির নাম ছিল নুগায়ের।

পাখিটি একদিন মরে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন উমায়ের মন খারাপ করে বসে আছে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু মজা করে বলেন, আবু উমায়ের! কই গেল তোমার নুগায়ের?

উমায়ের একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রিয় সন্তানের অসুস্থতায় আবু তালহা ভীষণ ভেঙ্গে পড়লেন। উমায়েরের অসুস্থতা দিন দিন বাড়তে থাকে। একদিন আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়েছিলেন। ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে অসুস্থ উমায়েরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সন্তানের পাশেই বসা ছিলেন মা উম্মে সুলাইম। উমায়েরের মৃত্যুতে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এলো। এমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটির মৃত্যুতে তাদের চোখে দেখা দিল শোকাশ্রু। উম্মে সুলাইম সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, সাবধান! কেউ আবু তালহাকে এখনই তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ো না। যা বলার আমি নিজেই বলবো।

এরপর উম্মে সুলাইম মৃত সন্তানকে তার জায়গায় রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করে তার অপেক্ষায় থাকেন। আবু তালহা ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন, উমায়ের কেমন আছে? উম্মে সুলাইম বলেন, আগের চেয়ে ভাল।

আবু তালহা তাকে দেখতে এগিয়ে যান, উম্মে সুলাইম বাধা দিয়ে বলেন, এখন না, ও শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে, ওকে নাড়াবে না।

এরপর তিনি স্বামীকে রাতের খাবার দেন। আবু তালহা তৃপ্তি ভরে খেলেন। এরপর উম্মে সুলাইম সাজগোজ করে স্বামীর কাছে এলেন, মিলন হল স্বামী স্ত্রীর।

উম্মে সুলাইম যখন দেখলে, স্বামী এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে তৃপ্ত। তখন তিনি বলেন, প্রাণের স্বামী! বলুন তো কেউ যদি কোন জিনিস কাউকে ধার

স্বরূপ দেয়, এরপর মালিক তা ফিরিয়ে নিতে চায়, সে জিনিস ফিরিয়ে না দেয়ার কোন অধিকার কি আছে?

আবু তালহা বলেন, ফিরিয়ে না দেয়ার অধিকার তাদের নেই। মূল মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়াই কর্তব্য।

উম্মে সুলাইম বলেন, তারা দিতে চায়না। অনেকদিন নিজেদের কাছে ছিল তো, মনে করেছিল, নিজেরাই মালিক। এখন যখন প্রকৃত মালিক তা নিতে এলো, তখন তারা দিতে অপ্রস্তুত হলো।

আবু তালহা বলেন, তারা এ কাজটি বড় খারাপ করেছে।

এবার উম্মে সুলাইম বলেন, এ যে আমাদের ছেলে– আবু উমায়ের সে ছিলো আল্লাহ্ তায়ালার ধার দেয়া জিনিস। তিনি এখন তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত শোনার পর আবু তালহা অস্থির হয়ে উঠলেন, পিতৃত্বের বেদনায় মন ডুকরে কেঁদে উঠল। তবুও তিনি ধৈর্য্য ধারণ করলে।

বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার কসম! আজ রাত্রে তুমি আমাকে ধৈর্যে পরাস্ত করতে পারবে না।

এরপর তিনি শান্তচিত্তে ছেলের দাফন কাফন সম্পন্ন করেন। সকালে উঠে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে সব কিছু বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য দোয়া করেন।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন,

এরপর আমি তাদের ঔরসে জন্ম লাভকারী সাতটি সন্তানকে দেখেছি মসজিদে নববীতে। সবাই কোরআনে হাফেজ ছিলেন।

প্রিয় বোন!

উম্মে সুলাইম সকল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনকে আকড়ে ধরে নিজে ধৈর্যের কত উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন।

তার চোখের সামনে কলিজার টুকরা সন্তান মারা যায়, তিনি ধৈর্যহারা হলেন না। এ বিপদের সময় ভুলে যাননি স্বামীর খিদমতের কথা! বিস্ময়কর এক নারী!

বোন! তুমি কি হতে পারনা উম্মে সুলাইমের মত? আজ উম্মে সুলাইমের মত নারীদের খুব বেশি প্রয়োজন। আফসোস! আজ দুনিয়াতে উম্মে সুলাইমের মত নারীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

আমরা মুহাম্মদী উম্মত

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

মান-সম্মান দেয়ার মালিকতো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন। আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা কেড়ে নেন।

ইলম, জ্ঞান, যশ খ্যাতি দেয়ার মালিক আল্লাহ্।

আমার রিযিকদাতা আল্লাহ্।

আমার সুস্থতা দানকারী আল্লাহ্।

আমার নিরাপত্তা দাতা আল্লাহ্।

আমার পেরেশানীর মুক্তিদাতা আল্লাহ্।

আমার আনন্দ, আমার বেদনার উপশম করবেন আল্লাহ্।

আমার জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা আল্লাহ্।

আমার বিজয়দাতা আল্লাহ্।

আর আমাদের গুনাহের কারণে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার আযাব গজবকে ডেকে আনি।

আর যদি আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করতে চান, তাহলে তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই। আমার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন আমার আল্লাহ্।

তো ভাই! ও বোনেরা! আমাদের মালিক আল্লাহ্! আসুন আল্লাহ্ তায়ালাকে রাজি করি। আল্লাহ্ তায়ালার বিধানগুলো মানি। আর এতেই তো আমাদের সফলতা। আমাদের সম্মান।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হতে হলে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবন আমাদের অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া কেউ সফল হতে পারবে না। আমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার নবীকে আপন বানাতে পারি। আমরা যদি প্রকৃত উম্মতে মুহাম্মদী হতে পারি। তাহলে দুনিয়ার সব সাফল্য আমাদের কাছে ছুটে আসবে। আসুন না আমরা মুহাম্মদী হই। এখনতো আমরা শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি। আমি বলছি তোমরা মুহাম্মদী হয়ে যাও। তোমরা যদি মুহাম্মদী হয়ে যাও, আল্লাহ্ তায়ালার কসম, তোমাদের হাতে আল্লাহ্পাক এমন পাওয়ার দিয়ে দেবেন, এমন কারামত দিয়ে দেবেন, যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

এখন তোমরা আমেরিকা যাচ্ছো, ইংল্যান্ড যাচ্ছো, অষ্ট্রিয়া যাচ্ছো। সেখান থেকে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরছ। আল্লাহ্

তায়ালার কসম, যদি তোমরা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শকেই কবুল করো তাহলে এসব ডিগ্রী দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। কেননা আমাদের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব করার চিকিৎসা আছে। আর তাদের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব করার দাওয়াই নেই।

উহুদ যুদ্ধের কথা বলছি। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বেহাল অবস্থা। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের ঘেরাওয়ে পড়ে গেছেন। কজন জানবাজ সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের তীর বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছেন। চারিদিকে থেকে অসংখ্য তীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে আসছে। সেখানে আবু বকর (রাযী.) আছেন, উমর (রাযী.) আছেন। আলী (রাযী.) আছেন। তালহা (রাযী.) আছেন, যুবায়ের (রাযী.) আছেন। সাদ বিন আবিওয়াক্কাস (রাযী.) আছেন। তীর আসছে, একজন জখমী হচ্ছেন, আরেকজন এসে দাঁড়াচ্ছেন। আবু তালহা (রাযী.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তীরের আঘাতে তিনি ঝাঝরা হয়ে পড়ে যান। তার স্থানে তালহা (রাযী.) এলেন। হাত দিয়ে তীর ঠেকাচ্ছেন। তার হাত চালনীর মত হয়ে গেল। এরপর আবু কাতাদা ইবনে নুমান (রাযী.) এলেন। তিনি বুক পেতে দাঁড়ালেন। প্রথম তীরটিই তার চোখে লাগে। চোখের পুতুলি বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ অবস্থা দেখে কান্না ধরে রাখতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখ থেকে তীরটি খুলেন। চোখ ক্ষত বিক্ষত। চোখ গলে গলে পড়ছে।

এখন আমাকে বলো, তোমাদের কোন বড় ডাক্তার এখানে এ মাহফিলে উপস্থিত থাকলে বলো, এ যখমের কি চিকিৎসা! ক্ষত-বিক্ষত উপড়ে যাওয়া এ চোখের চিকিৎসা কিভাবে সম্ভব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীর খুলেন, চোখটি তীরের সাথে হাতে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখটি হাতে নিয়ে কেঁদে দেন। বলেন, হে আমার রব! হে আমার রব! কাতাদার চোখ তোমার নবীর হিফাজতের জন্য যখমী হয়েছে। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এ চোখটি চাই। এ চোখটি তুমি এমনভাবে সুস্থ্য করে দাও, যেন এ চোখ দিয়ে পূর্বের চেয়ে আরও ভাল দেখতে পায়। এ দোয়া করে গলে যাওয়া চোখটি কাতাদার চোখের খুপড়িতে রাখেন এবং নিজে হাত মুবারক তাতে রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাত সরিয়ে নিলেন, দেখা যায় এ চোখ আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাযী.)-এর পায়ের নালা ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে ইহুদী চক্রান্তকারী আবু রাফে কে হত্যা করতে যান, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পায়ের নালা ভেঙ্গে যায়। তিনি নিজের পাগড়ি দিয়ে পা বেঁধে বহু কষ্টে উটে চড়ে মদীনায় এলেন।

দরবারে নববীতে এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো আবু রাফেকে কতল করে এসেছি। কিন্তু আমার পায়ের নালাতো ভেঙ্গে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পট্টি খোলো। তিনি পট্টি খোলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, কোথায় কোথায় ভেঙ্গেছে? দেখো তুমি সুস্থ হয়ে গেছো। আবদুল্লাহ বিন আতিক অনুভব করেন, যে তার পা ঠিক হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এ নিয়ামততো আল্লাহ্ তার প্রিয় রাসূলকে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাথে করে নিয়ে যান নি। তিনি শেষ নবী। তিনি এসব নিয়ামত উম্মতদের মাঝে বণ্টন করে গেছেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযী.) হুনাইনের যুদ্ধে গুরুতর যখম হয়েছিলেন। সমস্ত শরীর আঘাতে ঝাজরা হয়ে গিয়েছিল। একজন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, খালেদের সমস্ত শরীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চল দেখি। গিয়ে দেখেন– খালেদ বিন ওলিদ ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাত খালেদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাত উঠিয়ে নিলেন, দেখা যায় তার শরীরে একটি আঘাতের চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। আল্লাহু আকবার।

যে কওমের সাথে এমন উত্তম চিকিৎসা আছেন, তাহলে তাদের কি প্রয়োজন আমেরিকা ইউরোপের গোলামী করার? আজ তো আমরা ঈমান আমল সব বরবাদ করে বসে আছি। তাই নববী চিকিৎসার কথা ভুলে গেছি। ঈমান আমল মজবুত থাকলে আজও নববী চিকিৎসা আমাদের কাজে লাগত।

এক তাবেয়ী ইয়ামান থেকে আসতেছিলেন, রাস্তায় তার গাধা মরে যায়। তিনি অসহায় হয়ে যান। নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যান। নামায শেষে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমিতো জান, আমি তোমার পথে বের হয়েছি। এ বাহনতো আমার প্রয়োজনীয়, এ গাধাটিকে জিন্দা করে দিন।

মুনাজাত শেষে মৃত গাধার শরীরে চাবুক মেরে বলেন, ... আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে উঠে দাঁড়াও।

গাধা উঠে দাঁড়াল। যেন সে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল। আল্লাহু আকবার।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

জান্নাত পর্যন্ত পৌছার রাস্তা হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য। আমার এ জীবনকে আমি আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথে পরিচালনা করব। মনে রাখতে হবে, আমার এ অন্তর যেন আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য না হয়।

আমার জবান যেন সংযত থাকে।

এ চোখ যেন মন্দ দিকে না যায়।

এ কান যেন মন্দ কিছু না শোনে।

এ হাত যেন হারাম কিছু স্পর্শ না করে।

এ পা যেন হারামের দিকে না যায়।

আমার মস্তিষ্ক যেন হারাম খেয়াল, চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে।

আমার হৃদয়ে শুধু আল্লাহ্ থাকবে। এটাই তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আল্লাহ্ তায়ালাকে রাজি করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা তখনই রাজি হবেন, যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা মত চলব।

আমার ভাই ও বোনেরা। আল্লাহ্ তায়ালার পাকড়াও থেকে বাঁচতে হলে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা রহমানুর রাহীম। এ জন্য আমাদের সময় দিচ্ছেন। তওবার সুযোগ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার জন্য তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তওবার সুযোগ আছে। গলা পর্যন্ত রূহ আসার আগ পর্যন্ত তওবার সুযোগ আছে। নারী পুরুষ সবার জন্য। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের তরিকায় চলার তৌফিক দিন। আমীন।

ভালবাসা করো, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ার মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে মর্যাদাবান।

সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে প্রাণবন্ত, সবচেয়ে বিনয়ী, সবচেয়ে বিচক্ষণ, সবচেয়ে সুন্দর। সব আলো যার কাছে ম্লান। সবচেয়ে পবিত্র, আরও যত গুণ আছে সবগুলো বললেও তার সমান হবে না। আল্লাহ্ তায়ালার কসম! এসব উপাধি আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য যথেষ্ট নয়।

হায় হায়! দুনিয়ার মুহাব্বতে তো আমরা মজনু হয়ে যাচ্ছি। দিওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। আসুন না দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে যিনি সুন্দর, সে সুন্দরের প্রেমে পাগল হই। আমি বলছি, মুহাব্বত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সাথে হওয়া চাই। আমরাতো আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা ছেড়ে দুনিয়ার ভালবাসায় মজে আছি। ভাই নিজের সর্বনাশ করবেন না। আসুন আল্লাহ্ তায়ালাকে আপন বানাই।

আমাকে এক মহিলা ডাক্তার ফোন করে। সে যেসব কথা আমাকে বলে, তা শুনে আমি চমকে যাই। এসব কথা জীবনে বড় আল্লাহ্ ওয়ালার জবানেও আমি শুনিনি। সে মহিলা ডাক্তার ফয়সালাবাদের বাসিন্দা। সে নিজে ডাক্তার, তার স্বামীও ডাক্তার। আমার স্ত্রী তার নিয়মিত রোগী। মহিলা আমার শ্বশুরালয়ের নির্ধারিত ডাক্তার।

সে আমাকে বলেছেন, মাওলানা সাহেব! ক্রমে ক্রমে তো আমার জিন্দেগীর সমাপ্তি এসে যাচ্ছে। আর আমার আনন্দ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আমার সাক্ষাতের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তার কথায় বিস্মিত হলাম। বড় বড় বুযুর্গদের মুখে আমি যা শুনিনি, তার মুখ থেকে তা শুনেছি। যতই আমার বয়স বাড়ছে, আমার খুশিও বাড়ছে, আমার আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের সময়ও এগিয়ে এসেছে। আল্লাহু আকবার।

আসুন আমরা আমাদের ভালবাসার রোখ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে করে দেই। এ পথেই আছে দু'জাহানের সম্মানও মর্যাদা।

উহুদের যুদ্ধে মহিলা সাহাবী হযরত হিন্দা (রাযী.) শুনতে পেলেন আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। সে খালি পা, খোলা মাথায় (সে সময় পর্দার হুকুম আসেনি) উহুদের ময়দানে ছুটে যান। কেউ একজন বলে, তোমার স্বামী শহীদ হয়েছে। সে বলে, আল্লাহ্ তাকে কবুল করুন। আল্লাহ্ তায়ালার নবীর কি অবস্থা! একজন বলে, তোমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে? সে বলে, আল্লাহ্ তাকে কবুল করুন। বল, আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের কি অবস্থা? আরেকজন বলে, তোমার দু ছেলে শহীদ হয়েছে। সে বলে, আল্লাহ্ তাদের কবুল করুন। বলো, আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের কি অবস্থা?

জবাব এল, আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল আছেন। হিন্দা খুশিতে বলে, আমার আর কোন চিন্তা নেই। তিনি ভাল আছেন। আমি নিজ চোখে দেখতে চাই। এ ছাড়া আমার অন্তর ঠাণ্ডা হবে না।

সামনে গিয়ে, দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন, হিন্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে জমিনের উপর বসে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামা ধরে, বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল! আপনি ভাল আছেন দেখে আমার সব দুঃখ কষ্ট লাঘব হয়ে গেছে। কোন শোকই শোক মনে করিনা। কোন বেদনাই বেদনা মনে করিনা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দু'জাহানের ইজ্জত সম্মান নিহিত আছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিন্দেগীতে। এ পথে এসে যাও। আরবের গোলাম, হযরত বেলাল, হযরত সুমাইয়া, আম্মার, ইয়াসিরসহ আরও কত বঞ্চিত মানুষ এ পথে এসে আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হয়েছেন। তাই বলছি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ প্রিয় হাবীবের পথে এসো। নারীও সম্পদের ভালবাসায় সময় নষ্ট করো না। নোংরা অতীত থেকে তওবা করো। পুত পবিত্র হয়ে যাও। আল্লাহ্ তায়ালার কসম! আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন।

তাবলীগতো হলো তোমার জীবনকে পবিত্র করার মেহনত। তোমাকে ডাকছি, তওবার পথে, পবিত্রতার পথে, জান্নাতের পথে। ফিরে এসো তওবার পথে, জান্নাতের পথে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং আপন রবের সামনে অনুনয় বিনয় করেছে, নিশ্চয়ই তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা হুদ, আয়াত ২৩)

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে দ্বীনের পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

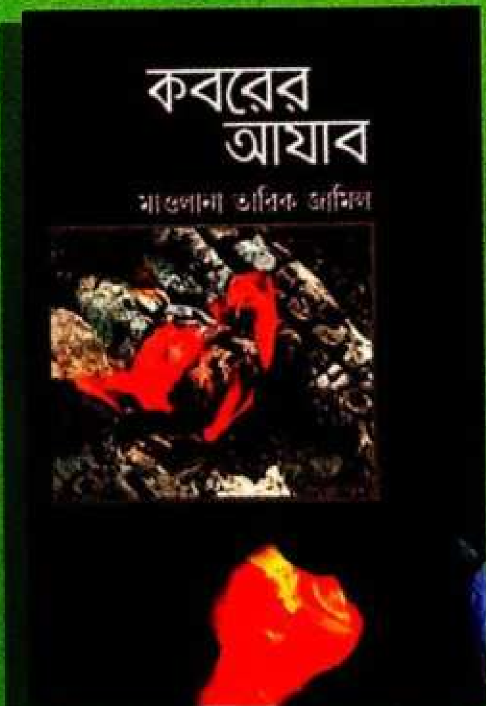

বিন্‌নূরী লাইব্রেরী
৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা।